প্রথম অধ্যায়
কুমোরপাড়ার গৌরী

"চাকার ঘূর্ণি ঘুরে চলে, জন্ম-মৃত্যুর দোল– মাটির হাঁড়ি গড়তে গড়তে ডাকি কৃষ্ণ অনন্তকাল।"

আষাঢ়ের শেষ বিকেল। সারা আকাশ জুড়ে মেঘের ভ্রুকুটি। কোথাও কোথাও বিদ্যুতের রেখা আঁকা পড়ছে কালো মেঘের গায়ে। দূরে শিলপুকুরের জলরাশি নিথর হয়ে আছে। বাতাসে সোঁদা মাটির গন্ধ। কাশবনের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে রাখালের বাঁশির সুর।

এই কুমোরপাড়ায় দিনের শুরু হয় মাটির সঙ্গে, দিনের শেষও মাটির সঙ্গে।

এখানে শিশুর কান্নার সঙ্গে মিশে থাকে চাকার ঘূর্ণনের শব্দ, আর বৃদ্ধের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশে থাকে পোড়ামাটির গন্ধ।

সেই কুমোরপাড়ারই এক কোণে খড়ের চালওয়ালা ছোট্ট একটি ঘর। সেখানেই বাস হরনাথ পালের।

হরনাথ ছিলেন পেশায় কুমোর, স্বভাবে কবি। সংসারে অভাব ছিল, কিন্তু তাঁর মুখে অভিযোগ ছিল না। ভোর হলে তিনি পুকুরে স্নান করে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালাতেন। তারপর মাটির চাকার সামনে বসে যেতেন।

চাকা ঘুরত, আর তাঁর ঠোঁট থেকে ভেসে আসত–

"মাটির দেহে প্রাণের বাঁশি, মাটিতেই সব মেশে– হরি নামে জীবন কেটে মানুষ হাসতে শেখে।"

তাঁর স্ত্রী গঙ্গা ছিলেন শান্ত, ধীর এবং বিদুষী নারী। গ্রামের স্কুল থেকে একসময় ভালো ফল করেছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে আর পড়াশোনা এগোয়নি। তবুও তিনি বইয়ের প্রতি ভালোবাসা ভুলতে পারেননি।

প্রায়ই বলতেন–

–দেখো গো, আমাদের যদি ছেলে-মেয়ে হয়, তাকে লেখাপড়া শেখাবো। মানুষ করব।

হরনাথ হাসতেন।

–আমার হাতে টাকা নেই গঙ্গা, তবে মন আছে। তোমার স্বপ্নের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব।

সেই বছর আশ্বিন মাসে কুমোরপাড়া যেন অন্যরকম হয়ে উঠল।

শিউলি ফুলে ভরে উঠেছে পথঘাট। ধানের ক্ষেতে বাতাস খেলছে। দূরে কুমড়ো ফুলের ওপর মৌমাছির গুঞ্জন।

ভোরের আলো ফুটতেই জন্ম নিল এক কন্যাশিশু।

শিশুটিকে দেখে ধাত্রী বুড়ি অবাক হয়ে বলেছিল–

–আহা! যেন মা দুর্গার প্রতিমা!

হরনাথের চোখ ভিজে উঠেছিল।

তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন–

–হে ভগবান, আমার ধন নেই, যশ নেই। শুধু আমার মেয়েটাকে ভালো মানুষ করো।

গ্রামের প্রধান শিক্ষক হরিচরণ মুখোপাধ্যায় খবর পেয়ে দেখতে এলেন।

তিনি শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন–

–গঙ্গা, এ মেয়ে সাধারণ নয়। ওর চোখে আমি আগুন আর করুণা–দুটোই দেখছি। ওকে পড়াশোনা শেখাস। মানুষের মতো মানুষ করিস।

গঙ্গা লজ্জায় বলেছিলেন–

–দাদা, গরিবের সংসার। কতটুকু পারব?

হরিচরণবাবু বলেছিলেন–

–মনে রাখিস, মেয়ে কখনও বোঝা নয়। সে ঘরের লক্ষ্মী, সমাজের শক্তি।

দিন কেটে গেল।

পাঁচ বছরে পা দিল গৌরী।

কিন্তু অন্য বাচ্চাদের মতো সে ছিল না।

মাটির পুতুল নিয়ে খেলতে খেলতেও সে প্রশ্ন করত–

–মা, আকাশ নীল কেন?

–বাবা, নদীর জল কোথায় যায়?

–বইয়ের ভেতরে কী থাকে?

হরনাথ আর গঙ্গা অবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

একদিন হাট থেকে কয়েকটি মাটির হাঁড়ি বিক্রি করে ফিরছিলেন হরনাথ। হাঁড়িগুলো পুরোনো খবরের কাগজে মোড়ানো ছিল।

গৌরী সেই কাগজ খুলে ছবিগুলো দেখছিল।
হঠাৎ সে মাকে জিজ্ঞাসা করল–
–মা, এই আঁকাবাঁকা দাগগুলো কী?
গঙ্গা মৃদু হেসে বললেন–
–ওগুলো অক্ষর মা। ওগুলো পড়তে পারলে অনেক কিছু জানা যায়।
গৌরীর চোখ জ্বলে উঠল।
–আমিও শিখব মা।
সেই থেকে তার নেশা হয়ে গেল অক্ষর।
পাড়ার আলোমাসি একদিন ঠাট্টা করে বলল–
–ওরে গঙ্গা, মেয়েমানুষকে আবার এত লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে? শেষে তো হাঁড়ি-কলসিই গড়তে হবে।
গৌরী সেদিন মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।
সে ধীর গলায় বলেছিল–
–আমি হাঁড়িও গড়ব, বইও পড়ব।
আলোমাসি হেসে চলে গেলেও গঙ্গার চোখে জল এসে গিয়েছিল।
সেই রাতে কুপির আলোয় ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ফিসফিস করে বললেন–
–মা দুর্গা, আমার মেয়ের স্বপ্নগুলোকে ভেঙে যেতে দিও না।
বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে।
খড়ের চাল বেয়ে জল পড়ছে টুপটাপ।
হরনাথ মাটির হাঁড়িগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে এসে দেখলেন, গঙ্গা ঘুমন্ত গৌরীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।
তিনি মৃদু স্বরে বললেন–
–কী ভাবছো?
গঙ্গা ধীরে বললেন–
–ভাবছি, আমাদের গৌরী একদিন অনেক বড় হবে।
হরনাথ হেসে বললেন–
–হবে গঙ্গা, অবশ্যই হবে। মাটির ঘরেও পদ্ম ফোটে।
বাইরে বিদ্যুতের ঝলকানি।
ভেতরে কুপির ম্লান আলো।
আর সেই আলোয় ঘুমিয়ে আছে এক ছোট্ট মেয়ে।
কেউ জানে না–
সময় তার জন্য কী ইতিহাস লিখে রেখেছে।
কেউ জানে না–
এই কুমোরপাড়ার ধুলো-মাখা পথেই একদিন জন্ম নেবে এক নতুন জাগরণ।
আর সেই জাগরণের নাম–
গৌরী।
যাকে একদিন সবাই ডাকবে–
কুমোরপাড়ার দুর্গা।
– প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত —

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাটির ঘরে স্বপ্নের আলো

ভোরের আকাশে তখনও লাল আভা ফুটে ওঠেনি। শিউলি গাছের নীচে সাদা ফুলের আস্তরণ। পুকুরপাড়ের কলমি লতার ফাঁকে ফাঁকে শিশিরবিন্দু মুক্তোর মতো ঝলমল করছে। দূরে মসজিদের আজান আর হরিমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি একাকার হয়ে কুমোরপাড়ার নিস্তব্ধ ভোরকে পবিত্র করে তুলেছে।
ছয় বছরে পা দিয়েছে গৌরী।

বয়স অল্প হলেও তার চোখে ছিল এক অদ্ভুত কৌতূহল। পৃথিবীর প্রতিটি বিষয় জানার জন্য তার অদম্য আগ্রহ।
একদিন ভোরে হরনাথ পাল মাটির দলা তৈরি করছেন। পাশে বসে গৌরী গভীর মনোযোগে দেখছে।
–বাবা, এই মাটি থেকে হাঁড়ি হয় কী করে?
হরনাথ হেসে বললেন–
–যেমন মা শিশুকে জন্ম দেয়, তেমনই শিল্পী মাটিকে প্রাণ দেয় মা।
–মাটিরও প্রাণ আছে?
–আছে রে। ভালোবাসা দিলে সবকিছুর প্রাণ জেগে ওঠে।
গৌরী চুপচাপ শুনছিল।
হঠাৎ বলল–
–আমিও তোমার মতো মাটি দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেবো, আর বই পড়ে বড় মানুষ হবো।
হরনাথ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।
সন্ধ্যায় হরিচরণ মাস্টারমশাই এলে গৌরী লজ্জা পেয়ে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।
–কী রে গৌরী, স্কুলে যাবি?
গৌরী মৃদু স্বরে বলল–
–যাবো।
–লেখাপড়া শিখবি?
–খুব শিখবো।
–কেন?
–বইয়ের ভিতরে যে অনেক আলো আছে।
হরিচরণবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।
তারপর হরনাথকে বললেন–
–হরনাথ, দেরি করিস না। মেয়েটাকে স্কুলে ভর্তি করে দে।
গঙ্গার চোখ আনন্দে ভিজে উঠল।
পরের সোমবার গৌরী নতুন ফ্রক পরে বাবার হাত ধরে বিদ্যালয়ে গেল।
ছোট্ট বিদ্যালয়।
খড়ের চাল।
সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ।
উঠোনে ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করছে।
গৌরীর বুকটা ধড়ফড় করছিল।
হরিচরণবাবু নিজে তার হাত ধরে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে গেলেন।
–এই যে, তোমাদের নতুন সাথী। নাম গৌরী।
সকলের দিকে লাজুক চোখে তাকালো সে।
প্রথম দিনেই বর্ণপরিচয়ের অক্ষর দেখে যেন তার চোখ জ্বলে উঠল।
অ, আ, ক, খ–
এই অক্ষরগুলিই যেন তার কাছে নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে দিল।
দিন যেতে লাগল।
গৌরী যা একবার পড়ত, তা আর ভুলত না।
অন্য ছাত্রছাত্রীরা যখন খেলায় মেতে থাকত, তখন সে গাছের ছায়ায় বসে বই দেখত।
একদিন দুপুরে হরিচরণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন–
–গৌরী, বড় হয়ে কী হবি?
গৌরী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল–
–মানুষ।
হরিচরণবাবু মৃদু হেসে বললেন–

–মানুষ তো তুই আছিসই। আর?
–অনেক মানুষকে পড়াবো। গরিব মেয়েদের কাঁদতে দেবো না।
বৃদ্ধ শিক্ষক স্তব্ধ হয়ে গেলেন।
এত ছোট মেয়ের মুখে এমন কথা!
সেদিন বাড়ি ফিরে তিনি নিজের স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন–
–এই মেয়েটা সাধারণ নয়। ঈশ্বর ওকে কোনো বিশেষ কাজের জন্য পাঠিয়েছেন।
ক্রমে গৌরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো সাকিলা নামের এক মুসলমান কিশোরীর।
সাকিলার বাবা রশিদ মিঞা ছিলেন মসজিদের মুয়াজ্জিন।
গরিব সংসার।
অভাবের শেষ নেই।
তবু রশিদ মিঞা মেয়েকে পড়াতে চেয়েছিলেন।
সাকিলা আর গৌরী দুজনেই একসঙ্গে বসে পড়ত।
একসঙ্গে টিফিন খেত।
ধর্ম তাদের আলাদা করত না।
মানুষ তাদের এক করে রেখেছিল।
একদিন সাকিলা কান্না করছিল।
গৌরী কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল–
–কাঁদছিস কেন?
–বাবা বলছে, আর পড়াতে পারবে না।
গৌরী তার হাত শক্ত করে ধরে বলল–
–না, তুই পড়বি। আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়ব।
–কিন্তু বই?
–আমার বই তোর বই।
–খাতা?
–আমার খাতা তোর খাতা।
–আর যদি সবাই বাধা দেয়?
গৌরীর ছোট্ট চোখ দুটি জ্বলে উঠল।
–তাহলে আমরা আরও বেশি পড়ব।
দূর থেকে হরিচরণ মাস্টারমশাই সব শুনছিলেন।
চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল তাঁর।
মনে মনে বললেন–
"এই মেয়েটার হৃদয়ে করুণা আছে, সাহস আছে, আলো আছে।"
সেই দিন থেকে কুমোরপাড়ার মানুষ লক্ষ্য করল–
মাটির হাঁড়ি গড়া কুমোরের মেয়ে গৌরীর মধ্যে যেন অন্যরকম একটা দীপ্তি আছে।
কেউ বলত–
–মেয়েটার মাথায় সরস্বতীর আশীর্বাদ আছে।
কেউ বলত–
–এ বড় হয়ে মাস্টার হবে।
আবার কেউ কেউ বিদ্রুপ করত–
–বেশি লেখাপড়া শিখে কী হবে? শেষে তো বিয়ে হয়ে যাবে।
গৌরী এসব শুনে চুপ করে থাকত।
কিন্তু গভীর রাতে কুপির আলোয় বই খুলে বসলে তার মনে হতো–
অক্ষরগুলো যেন আলো হয়ে জ্বলে উঠছে।
আর সেই আলো তাকে ডাকছে–

অনেক দূরে।

খুব দূরে।

যেখানে শুধু নিজের জন্য নয়–

অসংখ্য মানুষের জন্য বাঁচতে হয়।

সেই ছোট্ট মাটির ঘরে বসেই অজান্তে জন্ম নিচ্ছিল এক নতুন স্বপ্ন।

যার নাম–

সংগ্রাম।

আর সেই সংগ্রামের পথ ধরেই একদিন গৌরী হয়ে উঠবে–

কুমোরপাড়ার দুর্গা।

– দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত —

তৃতীয় অধ্যায়

সংগ্রামের পথে প্রথম পদক্ষেপ

"সংগ্রামের পথে কাঁটা থাকে, তবু পথিক থেমে যায় না– যে হৃদয়ে স্বপ্নের প্রদীপ জ্বলে, অন্ধকার তাকে হারাতে পারে না।"

বর্ষা কেটে গেছে। শরতের আকাশে তুলোর মতো সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। কাশফুলে সেজে উঠেছে নদীর দুই পাড়। কুমোরপাড়ায় তখন ব্যস্ততার শেষ নেই। দুর্গাপূজা আসছে। হরনাথ পালের উঠোনে সারি সারি প্রতিমা, ঘট, প্রদীপ আর ধুনুচি শুকোচ্ছে।

সকালের সূর্য উঠতেই হরনাথ চাকার সামনে বসে পড়েন। গঙ্গা সংসারের কাজ সামলান। আর ছোট্ট গৌরী, পড়ার বই হাতে নিয়ে কখনো বাবার পাশে, কখনো মায়ের কাজে সাহায্য করছে।

তখন সে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। একবার পড়লে সে ভুলে না। কবিতা আবৃত্তি, অঙ্ক, ইতিহাস–সবকিছুতেই তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি।

কিন্তু সংসারের অভাবও যেন দিন দিন বাড়ছিল।

মাটির হাঁড়ি-কলসির বিক্রি আগের মতো আর হয় না। বাজারে পিতল আর অ্যালুমিনিয়ামের বাসন আসতে শুরু করেছে।

হরনাথের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

এক রাতে খাওয়ার পরে গঙ্গা ধীরে বললেন–

–শুনছো, এভাবে আর কতদিন চলবে?

হরনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

–ভগবান জানেন।

–গৌরীর বইখাতা, স্কুলের খরচ–

–জানি গঙ্গা, সব জানি। কিন্তু আমি যে অসহায়!

পাশের ঘরে পড়তে পড়তে কথাগুলো শুনছিল গৌরী।

চুপচাপ বই বন্ধ করে বাইরে এসে বাবার পাশে বসে পড়ল।

–বাবা, তুমি চিন্তা করো না।

–কেন মা?

–আমি বড় হয়ে সব ঠিক করে দেব।

হরনাথ মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন।

–তুই শুধু মানুষ হ। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে গৌরী লক্ষ্য করল, সাকিলা মনমরা হয়ে বসে আছে।

–কী হয়েছে?

সাকিলা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল–

–মা খুব অসুস্থ। বাবা বলেছে, আমাকে হয়তো আর স্কুলে আসতে হবে না।

গৌরীর বুক কেঁপে উঠল।

–না, তুই স্কুল ছাড়বি না।

–কিন্তু সংসার?

–সংসারও চলবে, পড়াও চলবে। আমরা হার মানব না।

সেই কথোপকথন শুনে ফেলেছিলেন হরিচরণ মাস্টারমশাই।

তিনি গৌরীকে কাছে ডেকে বললেন–

–মা, তুই এত ছোট হয়েও অন্যের দুঃখ বুঝিস কী করে?

গৌরী মাথা নিচু করে বলল–

–যে কষ্ট দেখে, সে কষ্ট বুঝতে শেখে মাস্টারমশাই।

বৃদ্ধ শিক্ষকের চোখ ভিজে উঠল।

তিনি মনে মনে বললেন–

"এ মেয়ের হৃদয় খুব বড়।"

বছরের শেষে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো।

গোটা বিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে গৌরী।

প্রধান শিক্ষক নিজে তাকে ডেকে বললেন–

–গৌরী, তুই আমাদের গর্ব।

সমস্ত ছাত্রছাত্রী হাততালি দিয়ে উঠল।

কিন্তু আনন্দের মাঝেও এক বিষণ্ন ছায়া যেন হরনাথের মুখে।

কারণ, নতুন শ্রেণিতে ভর্তি করানোর টাকা তাঁর হাতে নেই।

সেই সন্ধ্যায় কুপির আলোয় গৌরী বই পড়ছিল।

হঠাৎ দেখে, বাবা চুপচাপ উঠোনে বসে আছেন।

চোখ দুটি আকাশের দিকে।

গৌরী কাছে এসে বলল–

–বাবা, তুমি কাঁদছো?

হরনাথ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

–না রে মা।

–আমাকে বলো।

–কিছু না।

গঙ্গা চোখ মুছতে মুছতে বললেন–

–নতুন বই কেনার টাকা নেই মা।

কিছুক্ষণ নীরব।

তারপর গৌরী ধীরে বলল–

–তাহলে পুরোনো বই দিয়েই পড়ব।

–কিন্তু খাতা?

–খাতা না থাকলে কাগজে লিখব।

–নতুন জামা?

–পুরোনো জামাই ভালো।

–তুই কষ্ট পাবি না?

গৌরী মৃদু হেসে বলল–

–কষ্ট তো মানুষকে শক্ত হতে শেখায় মা।

সেই রাতে ঘুম এল না গঙ্গার।

চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল মেয়ের মুখ।

তিনি মনে মনে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করলেন–

"হে জগজ্জননী, আমার মেয়েটার পথের কাঁটাগুলো তুমি সরিয়ে দিও।"

আর দূরে, শরতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ যেন নিঃশব্দে আশীর্বাদ বর্ষণ করছিল।

কেউ তখনও জানত না–

অভাব, দারিদ্র্য, অপমান আর চোখের জলের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠছিল এক অদম্য শক্তি।

যে শক্তি একদিন শুধু নিজের জন্য নয়–
সমস্ত কুমোরপাড়ার মেয়ে, সমস্ত অবহেলিত মানুষের জন্য আলোর প্রদীপ হয়ে উঠবে।
আর সেই পথের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে।
– তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত —

চতুর্থ অধ্যায়
নিতাই–ছায়াসঙ্গী
"কেউ আসে ঝড়ের মতো, কেউ আসে বসন্তের সুবাস হয়ে– আর কেউ কেউ, অজান্তেই হয়ে ওঠে জীবনের ছায়াসঙ্গী।"
শিলপুকুর গ্রামের পূর্বদিকে। তার একপাশে কাশবন, অন্যপাশে তালগাছ আর বাঁশঝাড়। বর্ষাকালে পুকুরের জল উপচে ছোট ছোট নালায় গিয়ে মিশত। শীতকালে সেই পুকুরের ঘাটে গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করত।
সেই শিলপুকুরের ধারে একসঙ্গে বড় হয়েছে গৌরী আর নিতাই।
নিতাই চক্রবর্তী।
বয়সে গৌরীর চেয়ে এক বছরের বড়।
পিতা হরিপদ চক্রবর্তী ছিলেন সামান্য কৃষক। অভাব তাদের সংসারেও ছিল, কিন্তু মানুষের দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিল নিতাই।
ছোটবেলায় গৌরী যখন পুকুরের ঘাটে পিছলে পড়ে কেঁদে উঠেছিল, তখন সেই নিতাই-ই তাকে তুলে এনে বলেছিল–
–এই পাগলী, কাঁদছিস কেন?
চোখের জল মুছে গৌরী বলেছিল–
–ব্যথা পেয়েছি।
–আমি আছি না?
সেদিনের সেই কথাটাই যেন অদৃশ্য বন্ধনের মতো দুজনের হৃদয়ে থেকে গিয়েছিল।
সময় বয়ে চলল।
গৌরী স্কুলে প্রথম হয়, আর নিতাই পড়াশোনার পাশাপাশি বাবাকে মাঠের কাজে সাহায্য করে।
কিন্তু গৌরীর প্রতি নিতাইয়ের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা ছিল অন্যরকম।
একদিন বিকেলে গৌরী মাথায় হাঁড়ির ঝুড়ি নিয়ে হাটে যাচ্ছে।
রাস্তা কাদায় ভরা।
হঠাৎ পা পিছলে হাঁড়ির ঝুড়ি পড়ে যেতে যাচ্ছিল।
দূর থেকে ছুটে এসে নিতাই সামলে নিল।
–এত ভারী বোঝা নিয়ে একা যাচ্ছিস কেন?
–কী করব? বাবা অসুস্থ।
–আমাকে ডাকলি না কেন?
–তোরও তো কাজ আছে।
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–তোর কাজের চেয়ে বড় কাজ আমার আর কী?
গৌরী চুপ করে রইল।
মেঘলা আকাশের নীচে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।
শিলপুকুরের জলে বাতাসের ঢেউ খেলছে।
হঠাৎ নিতাই বলল–
–গৌরী, তুই অনেক বড় মানুষ হবি।
গৌরী হাসল।
–বড় মানুষ হওয়া কি এত সহজ?
–তোর পক্ষে সহজ।
–কেন?
–কারণ তুই নিজের কথা কম, অন্যের কথা বেশি ভাবিস।

গৌরী কিছু বলল না।
শুধু পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে রইল।
সেদিন সন্ধ্যায় হাটে প্রচুর বিক্রি হলো।
ফেরার সময় বৃষ্টি নামল।
বড় বটগাছের নীচে আশ্রয় নিল দুজনে।
বিদ্যুতের ঝলকানিতে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছে।
গৌরী ভিজে কাপড় সামলাতে সামলাতে বলল–
–বৃষ্টি থামবে তো?
নিতাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল–
–সব ঝড় একদিন থামে।
এই কথাটা শুনে গৌরীর মনে হলো, কথাটা যেন শুধু বৃষ্টির জন্য নয়, জীবনের জন্যও সত্য।
একদিন বিদ্যালয় থেকে ফিরছিল গৌরী।
পথে কয়েকজন দুষ্ট ছেলে তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করতে লাগল।
–ওই দেখ, কুমোরের মেয়ে বিদ্যাসাগর হবে!
–বড় হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হবে বুঝি!
গৌরীর চোখে জল এসে গেল।
ঠিক তখনই কোথা থেকে এসে দাঁড়াল নিতাই।
–খবরদার!
তার কণ্ঠে এমন দৃঢ়তা ছিল যে ছেলেগুলো সরে গেল।
নিতাই বলল–
–মানুষকে ছোট করা খুব সহজ। কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হওয়া কঠিন।
গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
–তুই কেন সবসময় আমার পাশে দাঁড়াস?
নিতাই একটু হেসে বলল–
–ছায়া কি কখনো মানুষকে ছেড়ে যায়?
গৌরী উত্তর দিতে পারল না।
সন্ধ্যার আকাশে তখন প্রথম তারা ফুটেছে।
দূরে মসজিদের আজান আর মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি একসঙ্গে ভেসে আসছে।
সেই পবিত্র সন্ধ্যায়, কোনো প্রতিশ্রুতি নয়, কোনো প্রেমের ভাষা নয়–
শুধু দুটো সরল হৃদয়ের মধ্যে জন্ম নিল এক নীরব বিশ্বাস।
যে বিশ্বাসের নাম–
বন্ধুত্ব।
আর ভবিষ্যৎ জানত–
এই নীরব বন্ধুত্ব একদিন আগুনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবে।
সময় তাদের জন্য কী লিখে রেখেছে, তা তখনও কেউ জানত না।
শুধু শিলপুকুরের জলে ভাসমান চাঁদের প্রতিবিম্ব যেন নিঃশব্দে সাক্ষী হয়ে রইল।
– চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত —

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম আলো, প্রথম অন্ধকার

"যে প্রদীপ অধিক আলো দেয়, তার চারপাশেই ছায়া ঘনিয়ে আসে– যে ফুল সুবাস ছড়ায়, ঈর্ষার ঝড়ও তাকে ঘিরে ধরে।"

ফাল্গুন শেষ হয়ে চৈত্রের রুক্ষ দিন এসে পড়েছে। শিলপুকুরের জল অনেকটাই কমে গেছে। কুমোরপাড়ার পথে পথে ধুলো উড়ছে। গাছে গাছে কোকিলের ডাক। কিন্তু হরনাথ পালের মাটির ঘরে তখন অন্য এক আনন্দের হাওয়া।

চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে।

গোটা বিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে গৌরী।
হরিচরণ মুখোপাধ্যায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
সকল ছাত্রছাত্রীর সামনে তিনি বললেন–
–আজ আমি গর্বিত। আমাদের বিদ্যালয়ের গৌরী শুধু প্রথমই হয়নি, ওর মধ্যে আমি ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা দেখতে পাচ্ছি।
সকলেই হাততালি দিল।
গৌরী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।
প্রশংসা শুনলে তার লজ্জা লাগত।
বাড়িতে ফিরে সে মায়ের পায়ে মাথা রেখে বলল–
–মা, আমি প্রথম হয়েছি।
গঙ্গার চোখ আনন্দে ভিজে উঠল।
–সত্যি রে?
–হ্যাঁ মা।
গঙ্গা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন–
–আজ আমার জীবনের সব কষ্ট সার্থক হয়ে গেল।
সন্ধ্যায় খবর শুনে হরনাথ বাজার থেকে চারটে বাতাসা নিয়ে এলেন।
হেসে বললেন–
–আজ আমাদের রাজকন্যার উৎসব।
গৌরী হাসল।
–বাবা, চারটে বাতাসায় আবার উৎসব হয়?
–গরিবের উৎসব হৃদয় দিয়ে হয় মা।
কিন্তু সুখ যেন দীর্ঘস্থায়ী হলো না।
কয়েকদিন পর খবর এল–
গৌরী জেলা বৃত্তি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছে।
গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে গেল।
কেউ এসে আশীর্বাদ করল।
কেউ বলল–
–এই মেয়েটা একদিন অনেক বড় হবে।
কিন্তু সকলেই খুশি হলো না।
পাড়ার জমিদারবাড়ির গিন্নি মনোরমা দেবী একদিন বললেন–
–এত আদিখ্যেতার কী আছে? কুমোরের মেয়ে পড়াশোনা শিখে কী করবে?
পাশে বসা আর একজন বলল–
–শেষ পর্যন্ত তো হাঁড়ি-কলসিই গড়বে।
এই কথাগুলো গঙ্গার কানে পৌঁছাল।
রাতে তিনি একা একা কাঁদলেন।
হরনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–
–মানুষ যখন ভালো কিছু দেখে, তখন সবাই খুশি হয় না গঙ্গা।
গৌরী মায়ের চোখের জল দেখে বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে।
–মা, তুমি কাঁদছ কেন?
–না মা।
–মিথ্যে বলছো।
গঙ্গা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না।
সব কথা খুলে বললেন।
গৌরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর ধীর স্বরে বলল–

–মা, তারা যা খুশি বলুক। আমি কাউকে ঘৃণা করি না।

গঙ্গা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

–রাগ হচ্ছে না?

–না মা। যারা বুঝতে পারে না, তাদের উপর রাগ করতে নেই।

সেদিন দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল নিতাই।

তার বুকের ভিতর গর্বে ভরে উঠল।

মনে মনে বলল–

"ভগবান, এই মেয়েটাকে সবসময় এমনই রেখো।"

একদিন দুপুরে হরিচরণ মাস্টারমশাই গৌরীকে ডাকলেন।

–মা, তুই এখন জুনিয়র হাই স্কুলে ভর্তি হবি।

গৌরীর চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখটা ম্লান হয়ে গেল।

–স্যার, এত দূরের স্কুলে পড়ার খরচ?

হরিচরণবাবু হেসে বললেন–

–যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে পথও আছে।

কিন্তু সেই রাতেই হরনাথের শরীর খারাপ হলো।

প্রথমে জ্বর।

তারপর কাশি।

ক্রমে ক্রমে তিনি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন।

মাটির চাকা থেমে গেল।

উঠোনে শুকিয়ে রাখা হাঁড়িগুলো বিক্রি না হয়েই পড়ে রইল।

গঙ্গার মুখে উদ্বেগের ছাপ।

সংসারে অভাব আরও বাড়তে লাগল।

একদিন গভীর রাতে কাশতে কাশতে হরনাথ বললেন–

–গঙ্গা, যদি আমার কিছু হয়ে যায়, গৌরীর পড়া যেন বন্ধ না হয়।

গঙ্গা কেঁদে উঠলেন।

–অমন অমঙ্গল কথা বলো না।

হরনাথ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন–

–মা, মানুষের জীবনে ঝড় আসবেই। কিন্তু কখনো ভেঙে পড়বি না।

গৌরী বাবার হাত শক্ত করে ধরে বলল–

–তুমি সুস্থ হয়ে যাবে বাবা।

কিন্তু তার বুকের ভিতরে অজানা এক ভয় বাসা বাঁধল।

সেই রাতে আকাশে কালো মেঘ জমেছিল।

দূরে বিদ্যুতের ঝলকানি।

খড়ের চালের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ছিল টুপটাপ।

কুপির ক্ষীণ আলোয় গৌরী বসে ছিল বাবার মাথার কাছে।

বই খুলে রেখেছে, কিন্তু পড়ায় মন নেই।

শুধু বারবার মনে হচ্ছিল–

জীবনের আকাশে কী তবে নতুন কোনো অন্ধকার নেমে আসছে?

সে জানত না–

এই অন্ধকারই তাকে নিয়ে যাবে নতুন এক সংগ্রামের পথে।

আর সেই সংগ্রামই একদিন গড়ে তুলবে–

কুমোরপাড়ার দুর্গাকে।
— পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত —

ষষ্ঠ অধ্যায়
ঝড়ের পূর্বাভাস

"আকাশ যখন নিঃশব্দ হয়ে যায়, তখনই দূরে কোথাও ঝড় জন্ম নেয়। মানুষও তেমনি– হাসির আড়ালেই কখনো কখনো অদৃশ্য অশ্রু লুকিয়ে রাখে।"

শরৎ শেষ হয়ে হেমন্ত এসেছে। কুমোরপাড়ার মাঠে মাঠে সোনালি ধান পেকেছে। ভোরবেলায় শিশিরভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটলে পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দূরে শিউলি গাছের নীচে ঝরে পড়া ফুল কুড়িয়ে গ্রামের মেয়েরা মালা গাঁথে।

কিন্তু হরনাথ পালের ঘরে যেন হেমন্তের শান্তি নেই।

দিন দিন তাঁর কাশি বেড়েই চলেছে।

একসময় যে মানুষ ভোরের আলো ফুটতেই চাকার সামনে বসে যেতেন, সেই মানুষ এখন উঠোনের কোণে বসে হাঁপাতে থাকেন।

মাটির চাকা যেন অভিমানে থেমে গেছে।

উঠোনে শুকিয়ে রাখা হাঁড়ি, কলসি, প্রদীপগুলোর উপর ধুলো জমতে শুরু করেছে।

গঙ্গা দেবী মুখে কিছু না বললেও বুকের ভিতরটা ভেঙে পড়ছিল।

একদিন রাতে তিনি স্বামীকে বললেন–

–শুনছো, কাল তোমাকে কবিরাজের কাছে নিয়ে যাব।

হরনাথ মৃদু হেসে বললেন–

–এত খরচ কোথা থেকে হবে গঙ্গা?

–তোমাকে সুস্থ হতে হবে।

–আমি না থাকলেও সংসার চলবে।

গঙ্গা কেঁদে উঠলেন।

–চুপ করো! এমন কথা মুখে আনবে না।

পাশের ঘরে শুয়ে সব শুনছিল গৌরী।

তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

সেই রাতে সে আর ঘুমোতে পারল না।

ভোরের আগে উঠে পুকুরে জল আনল, হাঁস-মুরগিকে খাবার দিল, বাবার ওষুধের জন্য তুলসীপাতা আর বাসকপাতা বেটে রস তৈরি করল।

তারপর স্কুলের বই হাতে নিয়ে বসে পড়ল।

মেয়ের এই নীরব পরিবর্তন দেখে গঙ্গার বুক ভেঙে যেতে লাগল।

–মা, তুই এত কাজ করিস কেন?

গৌরী মৃদু হেসে বলল–

–বাবা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমিই তো তোমার ছেলে।

কথাটা শুনে গঙ্গা আর চোখের জল আটকে রাখতে পারলেন না।

সেইদিন বিকেলে নিতাই এল।

হাতে এক ঝুড়ি শাকসবজি।

–কাকিমা, মা পাঠিয়েছে।

গঙ্গা অবাক হয়ে বললেন–

–কেন বাবা?

–মা বলেছে, হরনাথ কাকার শরীর ভালো না। এগুলো নিয়ে যেতে।

হরনাথ দুর্বল গলায় বললেন–

–বাবা নিতাই, তোমাদের এত কষ্ট কেন?

নিতাই হেসে বলল–

–আপনি আবার এসব বলেন কেন? আপনি তো আমাদেরও কাকা।

গৌরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

তার চোখে কৃতজ্ঞতার জল।

সেদিন সন্ধ্যায় সাকিলাও এলো।

হাতে কিছু মুড়ি আর গুড়।

–গৌরী, মা পাঠিয়েছে।

গৌরী অবাক হয়ে বলল–

–তোর বাড়িতেও তো অভাব।

সাকিলা হেসে বলল–

–বন্ধুত্বের আবার অভাব কী?

দুই সখী একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠল।

হরিচরণ মাস্টারমশাই খবর পেয়ে এলেন।

হরনাথের মাথার কাছে বসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন–

–হরনাথ, চিন্তা করো না। গৌরীর পড়া বন্ধ হবে না।

হরনাথের চোখ ভিজে উঠল।

–মাস্টারমশাই, আমি গরিব মানুষ। মেয়েটার স্বপ্ন যেন ভেঙে না যায়।

হরিচরণবাবু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন–

–যতদিন আমি বেঁচে আছি, ওর পড়ার পথ কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

গৌরী বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

তার চোখে জল এল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল–

"আমি হার মানব না। বাবার স্বপ্ন ভাঙতে দেব না। যত কষ্টই আসুক, আমি লড়ব।"

সেই রাতেই আকাশে মেঘ জমল।

প্রচণ্ড বাতাস উঠল।

বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে।

খড়ের চালের ফাঁক দিয়ে জল পড়তে লাগল।

গঙ্গা হাঁড়ি-পাতিল রেখে জল সামলাচ্ছেন।

গৌরী বাবার মাথার কাছে বসে পাখা করছে।

হরনাথের শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে।

বাইরে বিদ্যুতের ঝলকানি।

দূরে শিলপুকুরের জলে বাতাসের তাণ্ডব।

হঠাৎ হরনাথ গৌরীর হাতটা শক্ত করে ধরে ফিসফিস করে বললেন–

–মা...

–বল বাবা।

–জীবনে অনেক ঝড় আসবে।

–হ্যাঁ বাবা।

–কিন্তু মনে রাখিস, মানুষ কখনো নিজের ভাগ্যের কাছে হার মানে না।

গৌরীর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

–তুমি সুস্থ হয়ে যাবে বাবা।

হরনাথ মৃদু হাসলেন।

কিন্তু সেই হাসির আড়ালে যেন এক অদ্ভুত বিষাদ লুকিয়ে ছিল।

সেই রাতের ঝড় যেন শুধু প্রকৃতিতে নয়–

নেমে এসেছিল হরনাথ পালের সংসারেও।

আর অদৃশ্য নিয়তির চাকা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করেছিল।

কেউ জানত না–
সময় খুব কাছে নিয়ে এসেছে এক কঠিন পরীক্ষাকে।
যে পরীক্ষার আগুনে পুড়ে,
মাটির কুমোরের মেয়ে গৌরী
একদিন সত্যিই হয়ে উঠবে–
কুমোরপাড়ার দুর্গা।
– ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত —

সপ্তম অধ্যায়
অশ্রুর রাত

"যে বৃক্ষ ছায়া দিয়ে যায়, সে চলে গেলে রোদটা বড় বেশি পোড়ায়। যে মানুষ ভালোবাসা দিয়ে বাঁচে, তার বিদায়ে শুধু ঘর নয়– আকাশটাও যেন শূন্য হয়ে যায়।"

শীতের শেষ রাত।
চারদিকে কুয়াশার চাদর।
মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে দূর বাঁশবাগানের দিক থেকে।
হরনাথ পালের শ্বাসকষ্ট সেদিন অনেক বেড়েছিল।
গৌরী সারারাত বাবার মাথার কাছে বসে ছিল।
গঙ্গা দেবী ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে বারবার প্রার্থনা করছিলেন–
–মা দুর্গা, আমার সিঁদুরটা কেড়ে নিও না।
ভোরের আগে হরিচরণ মাস্টারমশাইও এসে পৌঁছালেন।
কবিরাজমশাই এসে নাড়ি দেখে শুধু মাথা নাড়লেন।
হরনাথ মৃদু স্বরে বললেন–
–মাস্টারমশাই...
–বল হরনাথ।
–আমার গৌরীকে দেখবেন।
–ও আমারও মেয়ে।
–ওর পড়াশোনা...
–কখনো বন্ধ হবে না।
হরনাথ শান্ত চোখে গৌরীর দিকে তাকালেন।
–মা...
–বল বাবা।
–কাঁদিস না।
–না বাবা।
–মানুষের মতো মানুষ হবি।
–হব।
–মায়ের খেয়াল রাখবি।
–রাখব।
–আর...
কথা শেষ হলো না।
মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে হরনাথ পালের মাথাটা ধীরে ধীরে একদিকে হেলে পড়ল।
সব শেষ।
এক মুহূর্ত।
তারপর–
–ওগো...!

গঙ্গা দেবীর আর্তনাদে যেন পুরো কুমোরপাড়া কেঁপে উঠল।
–আমায় একা করে কোথায় গেলে গো?
গৌরী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।
চোখে জল নেই।
শুধু বাবার নিথর হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে বসে আছে।
তার মনে হচ্ছে–
এ কি সত্যি?
এই মানুষটাই তো গতকালও তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন–
"মানুষ কখনো হার মানে না।"
কুমোরপাড়ার মানুষ ছুটে এল।
হরিচরণ মুখোপাধ্যায় চোখ মুছতে মুছতে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।
নিতাই এসে দরজার পাশে দাঁড়াল।
সারা শরীর কাঁপছে।
যে মানুষটাকে সে ছোটবেলা থেকে "হরনাথ কাকা" বলে ডাকত, তিনি আজ আর নেই।
সাকিলা মায়ের সঙ্গে এসে গঙ্গা দেবীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।
মসজিদের মুয়াজ্জিন রশিদ মিঞাও এসে বললেন–
–আল্লাহ ভালো মানুষকে ভালোবাসেন। হরনাথ ভাই ভালো মানুষ ছিলেন।
সেদিন ধর্ম, জাত, ভেদাভেদ–সব ভুলে কুমোরপাড়ার মানুষ একসঙ্গে কেঁদেছিল।
শ্মশানের পথে যাওয়ার আগে গৌরী বাবার পায়ে মাথা রাখল।
একফোঁটা অশ্রুও এল না।
শুধু মনে মনে বলল–
"বাবা, তুমি চলে গেলে। কিন্তু তোমার স্বপ্ন আমি মরতে দেব না। তুমি দেখো– তোমার গৌরী হার মানবে না।"
শ্মশানের আগুন আকাশ ছুঁয়ে উঠল।
সূর্য অস্ত গেল।
শীতের সন্ধ্যা নেমে এল।
বাড়িতে ফিরে গঙ্গা দেবী সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন।
শাঁখা ভেঙে গেল।
এক মুহূর্তে যেন কয়েক যুগ বুড়িয়ে গেলেন তিনি।
রাতে ছোট্ট মাটির ঘরে মা-মেয়ে দুজন পাশাপাশি বসে।
কুপির আলো দুলছে।
চারদিকে নিস্তব্ধতা।
হঠাৎ গঙ্গা দেবী ফুঁপিয়ে উঠলেন–
–এখন আমাদের কী হবে মা?
সেই প্রথম গৌরীর চোখে জল এল।
মায়ের কোলে মাথা রেখে শিশুর মতো কেঁদে উঠল সে।
তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল–
–ভয় পেও না মা।
–কী করে বাঁচব?
–আমি আছি।
–তুই তো ছোট।
–আজ থেকে আমি আর ছোট নই মা।
গঙ্গা দেবী বিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
চৌদ্দ বছরের মেয়েটার চোখে যেন অন্য এক আগুন।

অন্য এক দীপ্তি।
সেই রাতে কুপির ক্ষীণ আলোয় গৌরী বাবার ব্যবহৃত মাটির চাকার দিকে তাকিয়ে রইল।
মনে হলো–
চাকাটা থেমে গেছে।
কিন্তু জীবন থেমে থাকতে পারে না।
মাটির মানুষ চলে যায়।
কিন্তু স্বপ্ন মরে না।
সেই রাতেই–
অশ্রুর মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, পিতৃহারা এক কিশোরীর হৃদয়ে জন্ম নিল এক নতুন প্রতিজ্ঞা।
সে আর শুধু হরনাথ পালের মেয়ে নয়।
সে এখন তার মায়ের আশ্রয়।
সে এখন নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।
এবং নিয়তি নীরবে লিখতে শুরু করল–
কুমোরপাড়ার দুর্গার অগ্নিপরীক্ষার প্রথম অধ্যায়।
– সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত —

অষ্টম অধ্যায়
অগ্নিশপথ
"ঝড়ে ভেঙে যায় দুর্বল ডাল, কিন্তু গভীর শিকড়ের বৃক্ষ মাথা নোয়ায় না। মানুষও তেমনি– দুঃখ তাকে ভাঙতে পারে না, যদি তার বুকের মধ্যে জেগে থাকে প্রতিজ্ঞার আগুন।"
হরনাথ পালের মৃত্যুর পর যেন কুমোরপাড়ার আকাশটাও বদলে গেল।
মাটির উঠোনে আর ভোরবেলায় ভেসে আসে না দোতারার সুর।
চাকার সামনে আর বসেন না হরনাথ।
শুকনো মাটির দলাগুলো এক কোণে পড়ে থাকে।
উঠোনে সাজানো অসমাপ্ত কলসিগুলোর দিকে তাকালে গঙ্গা দেবীর বুকটা হু হু করে ওঠে।
দিন কাটতে লাগল, কিন্তু সংসারের অভাব দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠল।
চালের হাঁড়ি শূন্য।
কুপির তেল শেষ হয়ে এসেছে।
কয়েকটা পুরোনো বাসন বিক্রি করে কোনোমতে দিন চলছে।
তবুও গঙ্গা দেবী মেয়ের সামনে কখনো চোখের জল ফেলতেন না।
কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকালেই গৌরী বুঝতে পারত–
ভিতরে ভিতরে মা ভেঙে পড়ছেন।
একদিন সকালে গৌরী বলল–
–মা, আমি আর স্কুলে যাব না।
গঙ্গা যেন বজ্রাঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।
–কেন মা?
–সংসার চালাতে হবে।
–না!
–মা–
–না, গৌরী। তোর বাবার স্বপ্ন ভাঙতে দেব না।
গৌরী মৃদু গলায় বলল–
–খালি পেটে স্বপ্ন বাঁচে না মা।
এই কথার উত্তর দিতে পারলেন না গঙ্গা।

চুপচাপ বসে রইলেন।

ঠিক তখনই উঠোনে এসে দাঁড়াল নিতাই।

হাতে এক বস্তা চাল।

আর সঙ্গে কিছু ডাল।

–কাকিমা, মা পাঠিয়েছে।

গঙ্গা বিস্মিত।

–না বাবা, এত কিছু আমরা নিতে পারব না।

–আমার মা বলেছেন, এটা দান নয়। আত্মীয়ের বাড়িতে কেউ দান দেয় না।

গঙ্গার চোখ ভিজে উঠল।

নিতাই গৌরীর দিকে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটার মুখ শুকিয়ে গেছে।

–গৌরী, স্কুলে যাচ্ছিস না কেন?

–আর পড়াশোনা হবে না নিতাই।

–কেন?

–সংসার।

–সংসার আমরাও চালাই।

–তুই বুঝবি না।

–না, তুই বুঝছিস না।

নিতাইয়ের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

–হরনাথ কাকা কী চেয়েছিলেন?

গৌরী মাথা নিচু করল।

–তোর পড়াশোনা।

–কিন্তু–

–কোনো কিন্তু নয়।

সেই সময় হরিচরণ মাস্টারমশাই এলেন।

সব শুনে তিনি কঠিন গলায় বললেন–

–গৌরী, স্কুল ছাড়বি?

–কী করব মাস্টারমশাই?

–আমি বেঁচে থাকতে তুই পড়া ছাড়বি না।

–বই কিনব কী দিয়ে?

–আমার পুরোনো বই আছে।

–ফি?

–আমি দেব।

–কিন্তু–

–আর কোনো কিন্তু নয়।

গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।

হঠাৎ সে হরিচরণবাবুর পায়ে মাথা রেখে কেঁদে উঠল।

–বাবা চলে গেলেন মাস্টারমশাই।

বৃদ্ধ শিক্ষক কাঁপা হাতে তার মাথায় হাত রেখে বললেন–

–হরনাথ চলে গেছে, কিন্তু আমি আছি মা।

আর ভগবান আছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় সাকিলা এলো।

হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ।

–এটা কী?

–তোর জন্য।
–কী আছে?
–খাতা আর কলম।
–এগুলো কোথা থেকে পেলি?
সাকিলা হেসে বলল–
–ঈদের সময় যে নতুন ওড়না কিনতে বলেছিলাম, সেই টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম।
গৌরী আর নিজেকে সামলাতে পারল না।
বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।
সেই রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর গৌরী একা উঠোনে এল।
পূর্ণিমার আলো পড়েছে।
বাবার পুরোনো মাটির চাকা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।
ধুলো জমেছে তার উপর।
গৌরী ধীরে ধীরে চাকার সামনে এসে দাঁড়াল।
কাঁপা হাতে চাকা ছুঁয়ে দিল।
মনে হলো–
বাবার হাতের উষ্ণতা যেন এখনও সেখানে লেগে আছে।
হঠাৎ তার চোখ ভরে উঠল।
–বাবা...
চারদিকে নিস্তব্ধতা।
শুধু দূরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।
গৌরী আকাশের দিকে তাকাল।
তারপর দু'হাত জোড় করে ফিসফিস করে বলল–
–তুমি শুনতে পাচ্ছ বাবা?
আমি হারব না।
আমি মাকে কাঁদতে দেব না।
আমি পড়াশোনা ছাড়ব না।
আমি মানুষের মতো মানুষ হব।
তোমার অসমাপ্ত স্বপ্ন আমি পূরণ করব।
এই কুমোরপাড়ার কোনো মেয়েকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেব না।
আমি কাঁদব, কিন্তু ভাঙব না।
আমি পড়ব, লড়ব, বাঁচব।
আমি হার মানব না।
চাঁদের আলোয় তার চোখের জল চিকচিক করে উঠল।
আর সেই মুহূর্তে–
মনে হলো, যেন অদৃশ্য কোথাও থেকে হরনাথ পালের কন্ঠ ভেসে এলো–
"ভয় পাস না মা। মানুষ কখনো হার মানে না।"
গৌরী ধীরে ধীরে বাবার মাটির চাকাটা ঘুরিয়ে দিল।
দীর্ঘদিন পরে আবার ঘুরতে শুরু করল চাকা।
ঘুরতে লাগল–
ধীরে ধীরে।
যেন সময়ের চাকা।
যেন নিয়তির চাকা।
যেন এক নতুন ইতিহাসের সূচনা।

আর সেই রাতেই–
চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী,
অশ্রুকে শক্তি করে,
দুঃখকে সঙ্গী করে,
নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।
সেই রাতেই–
মাটির কুমোরের মেয়ে গৌরীর ভিতরে
প্রথম জেগে উঠল–
কুমোরপাড়ার দুর্গা।
– অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত —

নবম অধ্যায়
নতুন সূর্যের অপেক্ষায়
"রাত যত গভীর হয়, ভোর তত কাছে আসে। অশ্রুর পরেই হাসি, পরাজয়ের পরেই জয়– প্রকৃতির এ এক চিরন্তন নিয়ম।"
হরনাথ পালের মৃত্যুর পর কেটে গেছে ছয় মাস।
বসন্ত এসে গেছে কুমোরপাড়ায়।
শিমুল-পলাশের আগুনরঙা ফুলে গ্রাম যেন নতুন সাজে সেজে উঠেছে। আমগাছে মুকুল এসেছে। কোকিলের ডাক ভেসে আসে ভোরের বাতাসে। কিন্তু হরনাথ পালের বাড়িতে বসন্তের আনন্দ নেই।
ভোর হতেই গৌরী উঠে পড়ে।
প্রথমে পুকুর থেকে জল তোলে।
তারপর মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজ।
সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বাবার পুরোনো চাকার সামনে বসে মাটির প্রদীপ আর ছোট ছোট ভাঁড় গড়ে দেয়।
গঙ্গা দেবী মাঝে মাঝে চুপ করে তাকিয়ে থাকেন।
মনে হয়, যেন হরনাথ আবার ফিরে এসেছে।
কিন্তু সেই মুখের মধ্যে এখন আর শিশুর সরলতা নেই।
সময়ের আগুনে গৌরী যেন অনেক বড় হয়ে গেছে।
একদিন গঙ্গা দেবী বললেন–
–মা, এত কাজ করিস, পড়াশোনা করতে কষ্ট হয় না?
গৌরী হাসল।
–কষ্ট হয় মা, কিন্তু কষ্টকে ভয় করলে মানুষ বাঁচবে কী করে?
গঙ্গার বুক ভরে উঠল।
মনে মনে বললেন–
"হরনাথ, তোমার মেয়েটা সত্যিই তোমার মতো হয়েছে।"
সেই সময় গ্রামের কয়েকজন আবার কথা বলতে শুরু করল।
আলোমাসি একদিন বলল–
–এই বয়সে মেয়েকে এত বাইরে বাইরে পাঠাচ্ছো কেন?
মনোরমা দেবী ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন–
–বেশি পড়াশোনা করলে মেয়েদের মাথা খারাপ হয়।
আরেকজন বলল–
–মেয়েমানুষের এত বিদ্যা দিয়ে কী হবে?
গঙ্গা চুপ করে সব শুনলেন।
কিন্তু সেদিন গৌরী নিজেই উত্তর দিল।
–বিদ্যা মানুষকে ছোট করে না মাসি, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যায়।
সবাই অবাক হয়ে গেল।
এত শান্ত স্বভাবের মেয়েটার কণ্ঠে এমন দৃঢ়তা!

সেদিন সন্ধ্যায় নিতাই এল।

হাতে কয়েকটা পুরোনো বই।

–এগুলো আমার মাস্টারমশাই দিয়েছেন।

–কী বই?

–অঙ্ক, ইতিহাস আর বাংলা।

গৌরী বইগুলো হাতে নিয়ে বলল–
–তুই সবসময় এত করিস কেন?
নিতাই একটু হেসে বলল–
–বন্ধুত্বের হিসাব হয় নাকি?
গৌরী মৃদু হেসে বলল–

–তুই না থাকলে হয়তো আমি এতদূর আসতে পারতাম না।

নিতাই কিছু বলল না।

চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার হৃদয়ের গোপন কথাগুলো তখনও শব্দ পায়নি।

সেই বছর জেলা বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষার খবর এল।
হরিচরণ মাস্টারমশাই নিজে এসে বললেন–
–গৌরী, তোকে পরীক্ষা দিতে হবে।
–আমি পারব মাস্টারমশাই?
–তুই না পারলে আর কে পারবে?
–কিন্তু বই?

–আমরা আছি।

–ফি?

–সেটাও হয়ে যাবে।

–যদি ফেল করি?

হরিচরণবাবু হেসে উঠলেন।

–পরিশ্রম কখনো ফেল করে না মা।

তারপর শুরু হলো কঠোর অধ্যবসায়।

দিনে সংসারের কাজ।

স্কুল।

ফিরে এসে মাটির প্রদীপ তৈরি।

রাতে কুপির ক্ষীণ আলোয় পড়াশোনা।

অনেক রাত পর্যন্ত।

কখনও ঘুমিয়ে পড়ে বইয়ের উপর।

গঙ্গা এসে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

নিতাই মাঝে মাঝে এসে অঙ্ক বুঝিয়ে দেয়।

সাকিলা এসে পড়া শোনে।

হরিচরণ মাস্টারমশাই নিজের ছেলের মতো যত্ন নেন।

একদিন গভীর রাতে পড়তে পড়তে গৌরীর চোখে জল এল।
বাবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল–
–বাবা, আমি পারব তো?
মনে হলো, যেন কোথাও থেকে ভেসে এলো–
"চেষ্টা কর মা। পরাজয়কে ভয় করিস না।"

পরীক্ষার দিন এসে গেল।

সাদা জামা।

চোখে ভয়।
হাতে কলম।
পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে গৌরী মাটিতে প্রণাম করল।
মনে মনে বাবাকে স্মরণ করল।
হরিচরণবাবু দূর থেকে আশীর্বাদ করলেন।
নিতাই বলল—
—ভয় পাস না।
সাকিলা বলল—
—তুই প্রথম হবি।
গৌরী মৃদু হাসল।
কিন্তু সে জানত না—
এই পরীক্ষার ফল শুধু তার ভবিষ্যৎ নয়,
তার জীবনকেও নতুন পথে নিয়ে যাবে।
নিয়তি নীরবে তার জন্য আরেকটি অধ্যায় প্রস্তুত করে রেখেছে।
যেখানে থাকবে—
আলো।
আনন্দ।
আর—
এক অপ্রত্যাশিত অন্ধকার।
কারণ—
সূর্য ওঠার আগে
দিগন্তে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার জমে।
— নবম অধ্যায় সমাপ্ত —

দশম অধ্যায়
সাফল্যের আলো, ঈর্ষার ছায়া
"ফুল ফুটলে মৌমাছিও আসে, আবার কাঁটাও জেগে ওঠে। মানুষের জীবনে সাফল্য এলে প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষাও নিঃশব্দে জন্ম নেয়।"
বৈশাখের প্রখর রোদ। মাঠের ধান ঘরে উঠেছে। কুমোরপাড়ার পথে পথে ধুলো উড়ছে। আমগাছে কাঁচা আম ঝুলছে, পুকুরের জলে পদ্মপাতা ভাসছে।
কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই গৌরীর মন অস্থির।
আজ বৃত্তি পরীক্ষার ফল বের হবে।
স্কুলে যাওয়ার আগে বাবার ছবির সামনে মাথা ঠেকিয়ে বলল—
—বাবা, আশীর্বাদ করো।
গঙ্গা দেবী মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন—
—ভয় পাস না মা, তোর বাবা আজও তোকে দেখছে।
বিদ্যালয়ে পৌঁছেই দেখল, সবার মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা।
হরিচরণ মাস্টারমশাইয়ের চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল।
দূর থেকেই তিনি ডাকলেন—
—গৌরী!
—জি মাস্টারমশাই।
—তুই শুধু পাশ করিসনি মা, পুরো মহকুমার মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছিস!
কথাটা শুনে গৌরীর মাথা যেন ঘুরে উঠল।
—আমি?
—হ্যাঁ মা, তুই।

বৃদ্ধ শিক্ষকের চোখে জল এসে গেল।
—আজ আমার শিক্ষক জীবন সার্থক।
গোটা বিদ্যালয় হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল।
সাকিলা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।
—আমি বলেছিলাম না তুই পারবি!
নিতাই দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিল।
তার বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে উঠল।
মনে হলো—
যেন নিজেরই সাফল্য।
সেদিন কুমোরপাড়ায় উৎসবের পরিবেশ।
রশিদ মিঞা এসে বললেন—
—মা, তুই শুধু হরনাথ ভাইয়ের মেয়ে নস, তুই আমাদেরও মেয়ে।
হরিচরণবাবু এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে এলেন।
গ্রামের মানুষ ভিড় জমাল।
সবাই আশীর্বাদ করতে লাগল।
গঙ্গা দেবী আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—
—হরনাথ, আজ তুমি কোথায়? তোমার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে গো!
কিন্তু সবাই খুশি হলো না।
জমিদারবাড়ির মনোরমা দেবী ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন—
—অত আনন্দের কী আছে? মেয়েমানুষ হয়ে দুটো পরীক্ষা পাস করেছে, তাই বলে আকাশ ভেঙে পড়েছে নাকি?
তাঁর ছেলে রতন, যে পরীক্ষায় ফেল করেছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।
তার চোখে হিংসার আগুন।
—একটা কুমোরের মেয়ে আমার চেয়ে ভালো ফল করবে?
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—
"এই অহংকার আমি ভেঙে দেব।"
সেই প্রথম অদৃশ্যভাবে জন্ম নিল এক নতুন বিপদের ছায়া।
সন্ধ্যায় নিতাই শিলপুকুরের ঘাটে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে এল।
সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে লাল হয়ে নেমে যাচ্ছে।
পুকুরের জলে বাতাসের ঢেউ।
দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ।
নিতাই মৃদু স্বরে বলল—
—খুব খুশি লাগছে।
—কেন?
—কারণ তুই জিতেছিস।
—তুইও তো জিতেছিস।
—আমি?
—হ্যাঁ। তুই, সাকিলা, মাস্টারমশাই—তোমরা না থাকলে আমি পারতাম?
নিতাই হেসে বলল—
—আমি তো শুধু পাশে ছিলাম।
—পাশে থাকাটাই তো সবচেয়ে বড় কথা।
সন্ধ্যার বাতাসে গৌরীর এলোমেলো চুল উড়ছিল।
নিতাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।
হঠাৎ নিজের অজান্তেই মনে হলো—

এই মেয়েটাকে ছাড়া তার পৃথিবী অসম্পূর্ণ।
কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।
শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল–
"ভগবান, ও যেন সবসময় হাসতে পারে।"
সেই সময় দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল আর একজন।
রতন।
তার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি।
–তাহলে ব্যাপার এই!
তার চোখে জ্বলছিল ঈর্ষা।
আর নিয়তি নিঃশব্দে তার খাতা খুলে লিখতে শুরু করল–
সাফল্যের আলো যত উজ্জ্বল হয়,
ঈর্ষার ছায়াও তত গভীর হয়।
গৌরী তখনও জানত না–
তার জীবনের আকাশে ধীরে ধীরে জমতে শুরু করেছে কালো মেঘ।
আর সেই মেঘের নাম–
রতন চৌধুরী।
– দশম অধ্যায় সমাপ্ত —

একাদশ অধ্যায়
কালো মেঘের ছায়া
"যেখানে আলো জ্বলে, সেখানে ছায়াও জন্ম নেয়। মানুষের সাফল্যের পথ কখনোই শুধু ফুলে সাজানো থাকে না– কাঁটাও তার সঙ্গী হয়ে আসে।"
আষাঢ় মাসের প্রথম দিক।
সারাদিন আকাশে মেঘের আনাগোনা। কুমোরপাড়ার সরু পথগুলো ভিজে কাদাময় হয়ে আছে। মাঠের ধারে কাশবন দুলছে বাতাসে।
শিলপুকুরের জল উপচে পড়েছে।
গৌরী এখন মহকুমা স্কুলে পড়ে।
প্রতিদিন ভোরে উঠে সংসারের কাজ সেরে, মায়ের হাতে ভাত বেঁধে দিয়ে, বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দুই ক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে যায়।
এই নিয়ে গোটা অঞ্চলে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।
কিন্তু তার সাফল্যই হয়ে উঠল কিছু মানুষের চোখের বিষ।
জমিদারপুত্র রতন চৌধুরী শহরের স্কুলে পড়লেও পড়াশোনায় মন ছিল না।
অহংকার আর বিলাসিতায় বড় হয়েছে।
বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, তাস খেলা, অন্যকে অপমান করাই ছিল তার আনন্দ।
গৌরীর সাফল্যের কথা শুনে প্রথমে তার মনে হিংসা জন্মেছিল।
তারপর একদিন বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে গৌরীকে দেখে অন্যরকম একটা আকর্ষণ জেগে উঠল।
কিন্তু সেটা ভালোবাসা ছিল না।
সেটা ছিল অহংকার।
যা চায়, তাই পাওয়ার নেশা।
একদিন বটতলার কাছে দাঁড়িয়ে রতন বলল–
–এই যে গৌরী!
গৌরী থেমে দাঁড়াল।
–কিছু বলবেন?
–তোমাকে একটা বই দিতে চাই।
–ধন্যবাদ, আমার বই আছে।
–আমি যদি বলি, তোমাকে শহরে পড়াব?

–আমার শিক্ষক আছেন, মা আছেন, ভগবান আছেন।
আর কিছু লাগবে না।
রতনের মুখ কালো হয়ে গেল।
–বড় অহংকার তোমার!
–অহংকার নয়। আত্মসম্মান।
বলেই গৌরী চলে গেল।
দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল নিতাই।
তার বুকের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল।
সেই সন্ধ্যায় শিলপুকুরের ঘাটে গৌরীকে একা পেয়ে সে বলল–
–রতনের সঙ্গে কথা বলছিলি কেন?
গৌরী অবাক।
–সে নিজেই ডাকল।
–ও মানুষটা ভালো নয়।
–আমি জানি।
–সাবধানে থাকিস।
–তুই এত চিন্তা করিস কেন?
নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।
তারপর বলল–
–সব কথা কি বলা যায়?
গৌরী মৃদু হেসে বলল–
–আমার ছায়াসঙ্গী হয়ে আবার এত কথা লুকিয়ে রাখিস কেন?
নিতাই মাথা নিচু করল।
কিন্তু বুকের ভেতরে যে ঝড় বইছে, তা প্রকাশ করল না।
এদিকে গ্রামের কিছু মানুষের মুখে কুৎসা শুরু হলো।
আলোমাসি একদিন ফিসফিস করে বলল–
–বেশি পড়াশোনা করলে মেয়েদের চরিত্র নষ্ট হয়।
আর একজন বলল–
–জমিদারপুত্রের সঙ্গে কথা বলেছে দেখেছি।
গঙ্গা দেবীর কানে এসব কথা পৌঁছতেই তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।
সেই রাতে মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন–
–মা, মানুষ খুব নিষ্ঠুর।
গৌরী মৃদু হাসল।
–মানুষ যা খুশি বলুক মা। সত্যি তো বদলাবে না।
–তুই কষ্ট পাচ্ছিস না?
–পাচ্ছি। কিন্তু বাবার কথা মনে পড়ে।
–কী বলেছিলেন?
–মানুষ হার মানে না।
পরের দিন স্কুল থেকে ফেরার সময় প্রবল বৃষ্টি নামল।
গৌরী বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে।
ঠিক তখনই রতন ছাতা নিয়ে এসে দাঁড়াল।
–এসো, পৌঁছে দিই।
–ধন্যবাদ, দরকার নেই।
–আমার কথা শুনতে হবে।

–কেন?
–কারণ আমি রতন চৌধুরী!
গৌরীর চোখে আগুন জ্বলে উঠল।
–আপনি জমিদারের ছেলে হতে পারেন, কিন্তু আমি হরনাথ পালের মেয়ে। আমার সম্মান আমার নিজের।
রতন অপমানিত হয়ে দাঁত চেপে বলল–
–এই অপমানের মূল্য দিতে হবে।
গৌরী কিছু না বলে বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে শুরু করল।
দূরে, অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি।
শিলপুকুরের জলে ঢেউ।
আর কোথাও যেন অদৃশ্য নিয়তি হাসল।
কারণ–
কালো মেঘ শুধু বৃষ্টি নিয়ে আসে না।
কখনো কখনো নিয়ে আসে বজ্রপাতও।
গৌরী তখনও জানত না–
এই অপমানিত অহংকার একদিন তার জীবনকে ঝড়ের মুখে ঠেলে দেবে।
আর সেই ঝড়েই প্রকাশ পাবে–
নিতাইয়ের নীরব ভালোবাসা,
সাকিলার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব,
এবং–
এক কিশোরীর দুর্জয় সাহস।
– একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

দ্বাদশ অধ্যায়
অপবাদ

"অগ্নিকে যত চাপা দাও, একদিন সে শিখা হয়ে জ্বলে ওঠে। সত্যকে যত আড়াল করো, একদিন সে সূর্যের মতো প্রকাশিত হয়।"
শ্রাবণের আকাশ সেদিন সকাল থেকেই মেঘে ঢাকা।
শিলপুকুরের জল থইথই করছে। কুমোরপাড়ার সরু পথ কাদায় ভরে গেছে। বাতাসে কদম ফুলের গন্ধ, কিন্তু গৌরীর জীবনে যেন অদৃশ্য অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে।
সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।
হরিচরণ মাস্টারমশাই অতিরিক্ত পড়া বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।
ফিরে এসে দেখে, গঙ্গা দেবী উঠোনে চুপচাপ বসে আছেন।
চোখ দুটো লাল।
মুখ শুকিয়ে গেছে।
–মা, কী হয়েছে?
গঙ্গা মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
–কিছু না।
–আমার দিকে তাকাও।
হঠাৎ গঙ্গা দেবী কেঁদে উঠলেন।
–মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন মা?
গৌরীর বুক কেঁপে উঠল।
–কী হয়েছে?
গঙ্গা দেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন–
–গ্রামে নোংরা কথা রটেছে।
–কী কথা?

–তোর নামে।

গৌরী স্থির হয়ে গেল।

–আমার নামে?

–বলছে, তুই নাকি জমিদারবাড়ির রতনের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করিস।

এক মুহূর্তে যেন মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ল।

–মা!

–আমি জানি, সব মিথ্যা।

–কে বলেছে?

–মানুষ বলছে।

–মানুষ?

–মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না মা।

গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তার বুকের ভেতরটা জ্বলে উঠল।

এই প্রথম।

হরনাথ পালের মেয়ে আজ প্রথমবার অপমানের বিষ অনুভব করল।

পরদিন স্কুলে যাওয়ার পথে কয়েকজন মহিলা তাকে দেখে ফিসফিস করে হাসতে লাগল।
কেউ বলল–
–ওই যে বড় বিদুষী!
কেউ বলল–
–এখন বুঝি জমিদারবাড়ির বউ হবে!

গৌরী মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু চোখের কোণে জমে থাকা জলকে বেরোতে দিল না।

স্কুলে পৌঁছে সাকিলা সব বুঝে গেল।
–কাঁদছিস?

–না।

–মিথ্যে বলিস না।

গৌরী আর নিজেকে সামলাতে পারল না।

বন্ধুর বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল।
সাকিলা তার চোখ মুছে দিয়ে বলল–

–মিথ্যে কথায় আকাশ ভেঙে পড়ে না।

আল্লাহ সব দেখেন।

সেদিন নিতাইও সব শুনেছিল।

তার মুখ কঠিন হয়ে উঠল।
–কে রটিয়েছে?
গৌরী মাথা নিচু করে বলল–

–জানি না।

কিন্তু নিতাই জানত।

রতন।
সেই সন্ধ্যায় রতনকে বাজারের মোড়ে পেয়ে নিতাই বলল–
–একটা কথা বলব?

রতন হাসল।

–বল কৃষকপুত্র।
–গৌরীর নামে কুৎসা কেন রটাচ্ছ?
–কী প্রমাণ আছে?

–প্রমাণ আমার বিবেক।
রতন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল–
–তুই কে?
নিতাইয়ের চোখে আগুন জ্বলে উঠল।
–আমি মানুষ।
আর মানুষ হয়ে অন্যায় সহ্য করতে শিখিনি।
দুজনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে লাগল।
লোকজন এসে থামাল।
কিন্তু রতনের চোখে তখন প্রতিহিংসার আগুন।
–ঠিক আছে নিতাই, তোরও হিসাব হবে।
এদিকে হরিচরণ মাস্টারমশাই খবর পেয়ে গৌরীকে ডেকে পাঠালেন।
–মা, কষ্ট পাচ্ছিস?
গৌরী মাথা নাড়ল।
–হ্যাঁ।
–রাগ হচ্ছে?
–হচ্ছে।
–ঘৃণা?
–না।
–কেন?
–বাবা শিখিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করতে নেই।
বৃদ্ধ শিক্ষক মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন।
–তুই অনেক বড় হবি মা।
খুব বড়।
সেই রাতে প্রবল বৃষ্টি নামল।
খড়ের চালের নীচে বসে গঙ্গা দেবী কাঁদছিলেন।
–আমার মেয়েটার কপালে এত দুঃখ কেন গো?
গৌরী মায়ের হাত ধরে বলল–
–মা, তুমি কাঁদো না।
–মানুষ যা বলছে...
–মানুষের কথায় সত্যি বদলে যায় না।
–তুই এত শক্ত হলি কী করে?
গৌরী জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।
বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে।
দূরে বাবার পুরোনো মাটির চাকা।
মৃদু স্বরে বলল–
–বাবা শিখিয়েছেন।
তারপর নিজের মনেই যেন ফিসফিস করে বলল–
*"আমি কাঁদব, কিন্তু হারব না।
আমি অপমান সহ্য করব, কিন্তু মাথা নত করব না।
আমি সত্যের পথ ছাড়ব না।
কারণ আমি হরনাথ পালের মেয়ে।"*
সেই রাতেই–
অশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে,

একটি নতুন আগুন জ্বলে উঠল।

অপমানের আগুন।

প্রতিবাদের আগুন।

আর অদৃশ্য কোথাও–
নিয়তি নীরবে লিখে রাখল–
এই আগুন একদিন
এক কিশোরীকে
শুধু গৌরী নয়,
কুমোরপাড়ার দুর্গা করে তুলবে।
– দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ত্রয়োদশ অধ্যায়
প্রতিবাদের প্রথম শিখা
"সহ্যেরও একটা সীমা আছে। যে নদী নীরবে বয়ে চলে, বাঁধ ভাঙলে সেই নদীই প্লাবন আনে। মানুষের হৃদয়ও তেমনি– অন্যায়ের ভার বেশি হলে প্রতিবাদই হয়ে ওঠে ধর্ম।"

ভাদ্র মাসের শেষ দিক।

সারাদিন আকাশে মেঘ আর রোদের লুকোচুরি। শিলপুকুরের জল ধীরে ধীরে কমছে। কাশফুলের সাদা ঢেউ মাঠের ধারে শরতের আগমনের বার্তা দিচ্ছে।

কিন্তু গৌরীর জীবনে যেন শান্তির কোনো আভাস নেই।

গ্রামের অলিতে গলিতে এখনও তার নামে নোংরা কথা।

গঙ্গা দেবী বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন।

একদিন দুপুরে উঠোনে বসে বাসন মাজতে মাজতে তিনি হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

–মা!

গৌরী ছুটে এসে মাকে কোলে তুলে ধরল।

মুখে জল দিল।

সাকিলা দৌড়ে কবিরাজ ডেকে আনল।

কবিরাজ নাড়ি দেখে বললেন–
–চিন্তা আর অনাহারে শরীর ভেঙে গেছে।

গৌরীর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

সেই রাতে মায়ের মাথার কাছে বসে সে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

–হে মা দুর্গা, আমার বাবাকে নিয়ে গেছ, মাকে নিও না।

ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

নিতাই।

হাতে দুধ আর কিছু ফল।

–কাকিমার জন্য।
গৌরী চোখ মুছে বলল–
–তুই সবসময় এভাবে পাশে থাকিস কেন?
নিতাই একটু হেসে বলল–
–সব প্রশ্নের উত্তর হয় না গৌরী।

–মানুষ আবার কথা বলবে।

–বলুক।

–তোর ভয় করে না?
–সত্যের জন্য ভয় কিসের?
পরদিন সকালেই নতুন বিপদ এল।

গ্রামের মোড়ে রতন চৌধুরী কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে।
গৌরী স্কুলে যাচ্ছে।
হঠাৎ বিদ্রূপ করে বলল–
–ওই যে বিদুষী দেবী!
জমিদারবাড়িতে কবে আসছ?
চারপাশে হাসির রোল উঠল।
গৌরীর পা থেমে গেল।
আজ সে মাথা নিচু করে চলে গেল না।
স্থির চোখে রতনের দিকে তাকাল।
–আপনি শিক্ষিত পরিবারের ছেলে?
রতন হেসে উঠল।
–কেন?
–কারণ শিক্ষিত মানুষ নারীকে অসম্মান করে না।
রতন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল–
–তাহলে?
–তাহলে আপনি শিক্ষিত নন।
চারপাশ নিস্তব্ধ।
রতনের মুখ লাল হয়ে উঠল।
–সাহস তো কম নয়!
–সাহস সত্যের থেকে আসে।
মিথ্যার থেকে নয়।
রতন দাঁত চেপে বলল–
–এই অপমান ভুলব না।
গৌরী শান্ত গলায় বলল–
–অপমান আপনি নিজেকেই করছেন।
বলে সে চলে গেল।
সেই ঘটনার পর রতন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল।
সন্ধ্যায় জমিদারবাড়িতে বসে বলল–
–এই মেয়েকে না ভাঙলে আমার নাম রতন নয়।
এদিকে গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল।
কেউ বলল–
–মেয়েটা ঠিক করেছে।
কেউ বলল–
–জমিদারের ছেলের সঙ্গে এভাবে কথা বলা উচিত হয়নি।
বিষয়টা শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত পর্যন্ত গড়াল।
গ্রামের প্রবীণরা বসলেন।
হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এলেন।
রশিদ মিঞাও এলেন।
জমিদারবাবুও এলেন।
গৌরীকে ডাকা হলো।
সবার সামনে দাঁড়িয়ে কিশোরী গৌরী।
মাথায় সাদা ওড়না।
চোখে কোনো ভয় নেই।

পঞ্চায়েত প্রধান জিজ্ঞাসা করলেন–
–মা, তুমি কিছু বলতে চাও?
গৌরী ধীরে উঠে দাঁড়াল।
–আমি শুধু পড়াশোনা করতে চাই।
আমার বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।
আমি কারও ক্ষতি করিনি।
তবুও কেন আমার নামে অপবাদ?
কেন শুধু মেয়ে বলে আমাকে অপমান সহ্য করতে হবে?
আমার অপরাধ কী?
আমি গরিব?
আমি কুমোরের মেয়ে?
নাকি আমি পড়াশোনা করি?
চারদিক নিস্তব্ধ।
হরিচরণ মাস্টারমশায়ের চোখ ভিজে উঠল।
রশিদ মিঞা মাথা নত করলেন।
অনেকের চোখ নিচু হয়ে গেল।
জমিদারবাবুও ছেলের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন–
–রতন, এসব কি সত্যি?
রতন চুপ।
প্রথমবার তার মাথা নত হলো।
সেদিন পঞ্চায়েতের সামনে সত্যের প্রথম বিজয় হলো।
বাড়ি ফিরে গঙ্গা দেবী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।
–তুই এত শক্ত হলি কী করে মা?
গৌরী মৃদু হাসল।
–আমি শক্ত নই মা।
বাবা, তুমি, মাস্টারমশাই, সাকিলা, নিতাই–
তোমরাই আমাকে শক্তি দিয়েছ।
সেদিন রাতে পূর্ণিমার আলোয় বাবার পুরোনো মাটির চাকার সামনে দাঁড়িয়ে গৌরী আকাশের দিকে তাকাল।
তার মনে হলো–
দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে হরনাথ পাল হাসছেন।
আর নীরবে আশীর্বাদ করছেন।
কিন্তু নিয়তি এখনও থেমে নেই।
কারণ আহত অহংকার সবচেয়ে ভয়ংকর।
আর রতনের হৃদয়ে তখন জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন।
যে আগুন–
শীঘ্রই নিয়ে আসবে
আরও ভয়ংকর এক ঝড়।
– ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

চতুর্দশ অধ্যায়
নিতাইয়ের ত্যাগ
"যে ভালোবাসা মুখে প্রকাশ পায়, সে ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে। কিন্তু যে ভালোবাসা নীরবে ত্যাগ হয়ে বেঁচে থাকে, সেই ভালোবাসাই ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো।"
শরৎ এসেছে।

কাশফুলের শুভ্র ঢেউয়ে শিলপুকুরের পাড় সেজে উঠেছে। ভোরের আকাশে শিউলি ফুলের গন্ধ, আর দূরে দূরে ঢাকের আওয়াজ–দুর্গাপূজার আগমনী বার্তা।

কিন্তু গৌরীর মনে উৎসবের আনন্দ নেই।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তার নাম উঠেছে ঠিকই, কিন্তু ভর্তি ফি, বইপত্র, পোশাক–সব মিলিয়ে যে টাকা লাগবে, তা গঙ্গা দেবীর পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব।

সেদিন রাতে মা-মেয়ে দুজনেই চুপচাপ।

কুপির আলোয় গঙ্গা দেবী হঠাৎ বললেন–

–মা, হয়তো এবার আর পড়া হবে না।

গৌরী মাথা নিচু করল।

–মা, তুমি কেঁদো না।

–তোর বাবার স্বপ্নটা পূরণ করতে পারলাম না।

–ভগবান যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।

কথাগুলো বললেও গৌরীর বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল।

সেই সময় দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল নিতাই।

কেউ তাকে দেখেনি।

নিঃশব্দে সে ফিরে গেল।

সেই রাতেই তার ঘুম এল না।

চাঁদের আলোয় শিলপুকুরের ঘাটে বসে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল–

–হে ভগবান, গৌরীর স্বপ্ন ভেঙে যেতে দিও না।

পরদিন সকালে নিতাই নিজের বাবার কাছে গিয়ে বলল–

–বাবা, আমি আর কলেজে পড়ব না।

হরিপদ চক্রবর্তী অবাক।

–কেন?

–সংসারের কাজে মন দেব।

–তুই তো পড়াশোনায় ভালো।

–সবাই সব পায় না বাবা।

হরিপদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

–যা ভালো বুঝিস।

কয়েকদিন পর নিতাই নিজের সযত্নে জমিয়ে রাখা টাকা, আর একজোড়া রুপোর বালা বিক্রি করে কিছু অর্থ জোগাড় করল।

সেই বালা ছিল তার মৃত ঠাকুমার স্মৃতি।

কিন্তু একবারও তার চোখে জল এল না।

শুধু মনে মনে বলল–

"যার হাসিতে আমার সুখ, তার স্বপ্নই আমার সম্পদ।"

সেদিন সন্ধ্যায় হরিচরণ মাস্টারমশাই গৌরীর বাড়িতে এলেন।

হাতে কিছু বই আর টাকা।

–মা, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

গৌরী বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

–কিন্তু কে দিল?

–ভগবান দিয়েছেন।

–না মাস্টারমশাই, সত্যি বলুন।

বৃদ্ধ শিক্ষক মৃদু হেসে বললেন–

–সব সত্যি সবসময় জানা ভালো নয়।

গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
সে বুঝতে পারল না, কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে নিতাই নিঃশব্দে হাসছিল।
সাকিলা এসে খুশিতে বলল–
–দেখলি! আল্লাহ কাউকে নিরাশ করেন না।
সেই দিনই গৌরীর ভর্তি হয়ে গেল।
কুমোরপাড়ার প্রথম মেয়ে হিসেবে সে উচ্চবিদ্যালয়ে পা রাখল।
হরিচরণবাবুর চোখে জল।
গঙ্গা দেবী দু'হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন–
–হরনাথ, তোমার স্বপ্ন বেঁচে আছে গো।
কিন্তু সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না।
রতন চৌধুরীর আহত অহংকার আবার জেগে উঠল।
একদিন বাজারে শুনল–
–গৌরী আবার পড়তে শুরু করেছে।
রতনের চোখ লাল হয়ে উঠল।
–তাহলে এখনও ভাঙেনি?
সে ঠোঁট কামড়ে বলল–
–দেখি, কতদূর যায়!
এদিকে একদিন বিকেলে শিলপুকুরের ধারে গৌরী আর নিতাই পাশাপাশি বসেছিল।
আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠেছে।
গৌরী হঠাৎ বলল–
–জানিস নিতাই, মাঝে মাঝে মনে হয়, ভগবান আমার জন্য অনেক মানুষ পাঠিয়েছেন।
–তাই?
–মা, মাস্টারমশাই, সাকিলা…
তারপর একটু থেমে–
–আর তুই।
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–আমি তো শুধু ছায়া।
গৌরীও হেসে বলল–
–ছায়া না থাকলে রোদ্দুরও যে বড় একা লাগে।
নিতাই মুখ ফিরিয়ে নিল।
চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল।
কারণ–
সে জানত,
তার হৃদয়ের গোপন কথা হয়তো কোনোদিন বলা হবে না।
কিন্তু ভালোবাসা তো পাওয়ার নাম নয়।
ভালোবাসা কখনো কখনো শুধুই–
ত্যাগ।
আর সেই ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষায়,
নিতাই ধীরে ধীরে হয়ে উঠছিল–
গৌরীর নীরব প্রহরী।
কিন্তু নিয়তি তখনও নীরবে লিখছিল এক ভয়ংকর অধ্যায়।
কারণ রতনের প্রতিশোধ এখন আর শুধু অপবাদে সীমাবদ্ধ নেই।
সে প্রস্তুত হচ্ছিল–
একটি ষড়যন্ত্রের জন্য।

যা কাঁপিয়ে দেবে কুমোরপাড়া,
আর বদলে দেবে গৌরীর জীবনের গতিপথ।
— চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত —

পঞ্চদশ অধ্যায়
ষড়যন্ত্রের জাল

"অন্ধকার যত গভীর হয়, আলোর জন্ম তত কাছাকাছি আসে। আর অন্যায় যখন সীমা ছাড়ায়, তখন সাধারণ মানুষও হয়ে ওঠে দুর্জয়।"

কার্তিক মাস।

ভোরবেলায় শিউলির গন্ধে ভরে থাকে কুমোরপাড়া। হালকা কুয়াশার চাদরে মোড়া মাঠ, আর শিলপুকুরের জলে ভোরের সূর্যের লাল আভা।

গৌরীর দিন শুরু হয় আগের মতোই।

সংসারের কাজ, স্কুল, আর রাত জেগে পড়াশোনা।

তবে এখন গ্রামের অনেকেই তাকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছে।

কিন্তু রতন চৌধুরীর মনে এখনও বিষ জমে আছে।

পঞ্চায়েতের দিন সবার সামনে অপমানিত হওয়ার পর সে যেন আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে।

একদিন সন্ধ্যায় বাজারের আড্ডায় তার কয়েকজন অসৎ সঙ্গীকে বলল—

—মেয়েটার এত অহংকার!

ওকে এমন শিক্ষা দেব যে, সারাজীবন মনে থাকবে।

তাদের মধ্যে একজন বলল—

—কিন্তু গ্রামের লোক?

রতনের ঠোঁটে কুটিল হাসি।

—সবাই যখন জানবে, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এদিকে শীতের আগমনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

স্কুল থেকে ফিরতে সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল গৌরীর।

হরিচরণ মাস্টারমশাই অতিরিক্ত অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

সূর্য অস্ত গেছে।

শিলপুকুরের পাশের পথটা প্রায় নির্জন।

হঠাৎ পিছন থেকে কারও কণ্ঠ—

—গৌরী!

সে ঘুরে তাকাল।

রতন।

আর সঙ্গে আরও দুজন।

গৌরীর বুক কেঁপে উঠল।

—রাস্তা ছাড়ুন।

রতনের মুখে অদ্ভুত হাসি।

—আজ এত তাড়াহুড়ো কিসের?

—আমাকে যেতে দিন।

—না গেলে?

গৌরী পিছিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় একজন তার পথ আটকে দাঁড়াল।

চারদিক অন্ধকার।

শিলপুকুরের জলে শুধু চাঁদের আবছা আলো।

গৌরীর গলা শুকিয়ে গেল।

সে চিৎকার করে উঠল—

—বাঁচাও!

ঠিক তখনই দূরে সাইকেলের আলো।
নিতাই।
সে বাজার থেকে ফিরছিল।
চিৎকার শুনেই সাইকেল ছুড়ে দৌড়ে এল।
–কে ওখানে?
রতন ঘুরে তাকাল।
–তুই?
নিতাইয়ের চোখে আগুন।
–এক পা এগোলে ভালো হবে না।
রতন হেসে উঠল।
–তুই একা?
কিন্তু নিতাই সেদিন আর সেই শান্ত কৃষকপুত্র ছিল না।
গৌরীর আতঙ্কিত মুখ দেখে তার সমস্ত রক্ত যেন আগুন হয়ে উঠল।
সে রতনের হাত সরিয়ে গৌরীকে পিছনে দাঁড়াতে বলল।
–গৌরী, ভয় পাস না।
রতন ক্রুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
ধস্তাধস্তি শুরু হলো।
রতনের সঙ্গীরা নিতাইকে মারতে লাগল।
তার কপাল ফেটে রক্ত বেরোতে লাগল।
তবু সে এক মুহূর্তের জন্যও পিছিয়ে গেল না।
হঠাৎ গৌরী চিৎকার করে উঠল–
–লোকজন! বাঁচাও!
চিৎকার শুনে মাঠ থেকে কয়েকজন কৃষক ছুটে এল।
রশিদ মিঞাও ছিলেন তাদের মধ্যে।
লোকজন আসতে দেখে রতন ও তার সঙ্গীরা পালিয়ে গেল।
নিতাই মাটিতে বসে পড়েছে।
কপাল রক্তে ভিজে গেছে।
গৌরীর চোখ ভরে উঠল।
–নিতাই!
–আমি আছি।
–তুই আহত হয়েছিস!
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–তুই ঠিক আছিস তো?
এই প্রথম গৌরী আর নিজেকে সামলাতে পারল না।
অশ্রুসিক্ত চোখে বলল–
–তুই না এলে আজ আমি বাঁচতাম না।
নিতাই শুধু বলল–
–আমি না থাকলেও ভগবান তো আছেন।
সেদিন রাতেই গোটা কুমোরপাড়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল।
মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।
হরিচরণ মাস্টারমশাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন–
–আজ অন্যায় সীমা ছাড়িয়েছে।
রশিদ মিঞা বললেন–

–এ বিচার হবেই।
গঙ্গা দেবী নিতাইয়ের মাথায় হাত রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন–
–বাবা, তুই আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছিস।
আজ থেকে তুই শুধু নিতাই নস, তুই আমার ছেলেও।
নিতাই মাথা নিচু করে রইল।
আর দূরে দাঁড়িয়ে গৌরী চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে ছিল।
তার হৃদয়ের গভীরে আজ নতুন এক অনুভূতির জন্ম হলো।
এ কি শুধু বন্ধুত্ব?
নাকি এর নাম আরও অন্য কিছু?
কিন্তু তার আগেই–
পরদিন সকালে সমগ্র কুমোরপাড়ার মানুষ জমিদারবাড়ির সামনে জড়ো হলো।
কারণ এবার শুধু গৌরীর অপমান নয়–
সমস্ত গ্রামের সম্মানের প্রশ্ন।
আর নিয়তি নীরবে প্রস্তুত করছিল–
এক নতুন অধ্যায়।
যেখানে বিচার হবে।
মুখোশ খুলবে।
আর কুমোরপাড়ার মানুষ প্রথমবার দেখবে–
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যের শক্তি কত বড়।
– পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ষোড়শ অধ্যায়
জনতার বিচার
"অন্যায় যত শক্তিশালী হোক, সত্যের সামনে তাকে মাথা নত করতেই হয়। মানুষ একা দুর্বল, কিন্তু মানুষের ঐক্য– ভগবানের আশীর্বাদের মতো।"
কার্তিকের শেষভাগ।
সকালের কুয়াশা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। শিলপুকুরের জলে সূর্যের লাল আভা পড়েছে। কিন্তু সেদিন কুমোরপাড়ার বাতাসে যেন অন্যরকম উত্তেজনা।
রাতের ঘটনার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।
যে গৌরীকে নিয়ে একদিন কুৎসা রটেছিল, আজ সেই গৌরীর জন্যই গ্রামের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে।
সকাল হতেই রশিদ মিঞা, হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, হরিপদ চক্রবর্তী, কৃষক, জেলে, কামার, কুমোর–সবাই জমিদারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।
জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী এত মানুষের ভিড় দেখে বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এলেন।
–কী হয়েছে?
হরিচরণবাবু কঠিন গলায় বললেন–
–আজ আপনার ছেলে রতনের বিচার চাই।
–রতন?
রশিদ মিঞা বললেন–
–গরিবের মেয়ের সম্মানও সম্মান, জমিদারবাবু।
শশাঙ্কবাবু বিস্মিত।
–কী করেছে সে?
ঠিক তখনই আহত নিতাইকে নিয়ে এল হরিপদ।
মাথায় ব্যান্ডেজ।
আর তার পাশে দাঁড়িয়ে গৌরী।

মাথায় সাদা ওড়না।
চোখে জল নেই।
শুধু গভীর অভিমান।
সব কথা শুনে জমিদারবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
তিনি লোক পাঠিয়ে রতনকে ডাকলেন।
রতন এসে প্রথমে সব অস্বীকার করল।
কিন্তু তার দুই সঙ্গী গ্রামের চাপে সত্যি কথা স্বীকার করে ফেলল।
মুহূর্তে চারদিক নিস্তব্ধ।
জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরীর চোখ ভিজে উঠল।
তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন–
–তুই আমার মুখে কালি দিলি!
রতন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।
–বাবা, আমি–
–চুপ!
তারপর তিনি গৌরীর সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন।
–মা, আমি অপরাধী নই, কিন্তু অপরাধীর বাবা। আমাকে ক্ষমা করো।
সবাই স্তব্ধ।
একজন জমিদার, এক কুমোরের মেয়ের সামনে মাথা নত করেছেন!
গৌরীর চোখে জল এসে গেল।
–আপনি বড় মানুষ। আমার বাবার বয়সী। এভাবে বলবেন না।
শশাঙ্কবাবু কাঁপা গলায় বললেন–
–আজ বুঝলাম, বড় হওয়া সম্পত্তিতে নয়, চরিত্রে।
সেদিন গ্রামের পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত হলো–
রতনকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
এবং সে যতদিন অনুতপ্ত না হবে, ততদিন গ্রামের কোনো সামাজিক কাজে তাকে স্থান দেওয়া হবে না।
রতনের চোখে প্রথমবার অনুশোচনার ছায়া দেখা গেল।
সে একবার গৌরীর দিকে তাকাল।
কিন্তু গৌরী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।
সন্ধ্যায় কুমোরপাড়ার মন্দিরে আর মসজিদের সামনে প্রদীপ জ্বালানো হলো।
মানুষের মুখে একটাই কথা–
–গৌরী আমাদের মেয়ে।
–ওর সম্মান মানে গ্রামের সম্মান।
হরিচরণবাবুর চোখ আনন্দে ভরে উঠল।
–আজ হরনাথ থাকলে কত খুশি হতো!
গঙ্গা দেবী আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন–
–দেখছো তো হরনাথ? আমাদের মেয়েকে সবাই নিজের মেয়ে বলে ডাকছে।
রাতে নিতাই শিলপুকুরের ধারে একা বসেছিল।
মাথার ব্যথা এখনও যায়নি।
চাঁদের আলোয় পুকুরের জল ঝিকমিক করছে।
হঠাৎ পিছন থেকে মৃদু কন্ঠ–
–নিতাই।
সে ফিরে তাকাল।
গৌরী।

–এত রাতে?
–তোর কাছে এসেছি।
নিতাই অবাক।
–কেন?
গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
–ধন্যবাদ বলতে।
–ধন্যবাদ?
–তুই নিজের প্রাণের কথা না ভেবে আমাকে বাঁচিয়েছিস।
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–তুই না থাকলে আমার পৃথিবীটাই অন্ধকার হয়ে যেত।
কথাটা বলেই সে চুপ করে গেল।
মুখ ঘুরিয়ে নিল।
কিন্তু গৌরী শুনে ফেলেছে।
কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।
দূরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।
তারপর গৌরী ধীরে বলল–
–ছায়াসঙ্গী, রোদ্দুরকে কেউ একা ছেড়ে যায়?
নিতাই বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।
চাঁদের আলোয় গৌরীর মুখে মৃদু হাসি।
কিন্তু তার চোখে জল।
কোনো প্রেমের ভাষা নয়।
কোনো প্রতিশ্রুতি নয়।
শুধু দুই হৃদয়ের নিঃশব্দ বোঝাপড়া।
শিলপুকুরের জল যেন সেই নীরব মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইল।
কিন্তু নিয়তির পথ এখনও দীর্ঘ।
কারণ–
সামনের পথ শুধু ভালোবাসার নয়।
সামনে আছে দারিদ্র্য, উচ্চশিক্ষার সংগ্রাম, শহরে যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা–
আর আছে এক নতুন স্বপ্ন।
যে স্বপ্ন একদিন গৌরীকে শুধু কুমোরপাড়ার নয়,
অসংখ্য অবহেলিত মানুষের আশার আলো করে তুলবে।
– ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত —

সপ্তদশ অধ্যায়
বিদায় শিলপুকুর
"সব বিদায় বিচ্ছেদ নয়– কিছু বিদায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি। কিছু অশ্রু দুঃখের নয়– স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাওয়ার আশীর্বাদ।"
অগ্রহায়ণের সকাল।
ধান কাটা শেষ হয়েছে। মাঠজুড়ে খড়ের গাদা। শিলপুকুরের জলে হালকা কুয়াশা। শিউলি ঝরে গেছে, হেমন্তের সোনালি রোদ নেমে এসেছে কুমোরপাড়ার প্রতিটি উঠোনে।
সেই সকালেই হরিচরণ মুখোপাধ্যায় খবর নিয়ে এলেন।
–গৌরী, মহকুমা কলেজ থেকে চিঠি এসেছে।
গৌরীর বুক কেঁপে উঠল।
–চিঠি?
–হ্যাঁ মা, তোর মেধাবৃত্তি হয়েছে। শহরে গিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিস।

গঙ্গা দেবীর চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।
–শহরে?
গৌরীর হাতে কাগজটা কাঁপতে লাগল।
এতদিনের স্বপ্ন!
বাবার অসমাপ্ত আশা!
কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
–মাকে একা রেখে?
হরিচরণবাবু বললেন–
–মানুষকে বড় হতে হলে কখনো কখনো নিজের মাটিকেও সাময়িক ছেড়ে যেতে হয় মা।
গঙ্গা দেবী হাসতে চাইলেন।
কিন্তু চোখের জল লুকোতে পারলেন না।
–তুই যাবি মা।
আমার জন্য ভাবিস না।
সেই সন্ধ্যায় শিলপুকুরের ঘাটে বসেছিল গৌরী।
আকাশে একফালি চাঁদ।
জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব।
পাশে এসে চুপচাপ বসল নিতাই।
–শুনেছি, তুই শহরে যাবি।
গৌরী মাথা নিচু করল।
–হ্যাঁ।
–খুব ভালো খবর।
কিন্তু নিতাইয়ের গলায় আনন্দের সঙ্গে মিশে ছিল অদ্ভুত কষ্ট।
অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ।
তারপর গৌরী বলল–
–শিলপুকুরকে ছেড়ে থাকতে পারব?
–মানুষ সব পারে।
–তুই পারবি?
নিতাই একটু হাসল।
–আমি তো এখানেই থাকব।
এই পুকুর, এই কাশবন, এই মাটির ঘর–সবকিছু আগলে রাখব।
যখন ফিরবি, সব আগের মতো পাবি।
গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
–আর তুই?
–আমি?
–তুইও আগের মতো থাকবি?
নিতাই আকাশের দিকে তাকাল।
–ছায়া কি কখনো পাল্টায়?
গৌরী মুখ ফিরিয়ে নিল।
তার চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু চাঁদের আলোয় চিকচিক করে উঠল।
বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল।
সারা গ্রাম যেন বিষণ্ণ।
রশিদ মিঞা বললেন–
–মা, বড় হয়ে যেন আমাদের ভুলে যাস না।

সাকিলা কাঁদতে কাঁদতে বলল–
–প্রতিদিন চিঠি দিবি।
হরিচরণবাবু গৌরীর মাথায় হাত রেখে বললেন–
–মনে রাখিস, বিদ্যা মানুষের জন্য।
শুধু নিজের জন্য নয়।
গঙ্গা দেবী সারারাত ঘুমোতে পারলেন না।
মেয়ের জামাকাপড় গুছিয়ে দিলেন।
হরনাথ পালের পুরোনো কলমটা হাতে দিয়ে বললেন–
–এটা তোর বাবার স্মৃতি।
সবসময় কাছে রাখিস।
গৌরী কলমটা কপালে ঠেকিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরল।
ভোর হলো।
স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছে গোটা কুমোরপাড়া।
ট্রেনের হুইসেল শোনা যাচ্ছে।
গঙ্গা দেবী আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।
–নিজের খেয়াল রাখিস মা।
গৌরী মায়ের পায়ে মাথা রাখল।
–আশীর্বাদ করো।
হরিচরণবাবুর চোখ ভিজে উঠেছে।
সাকিলা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।
আর একটু দূরে–
চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিতাই।
কোনো কথা নেই।
শুধু দু'চোখে অগাধ শূন্যতা।
ট্রেন ছাড়ার আগে গৌরী এগিয়ে এল।
–নিতাই।
–হ্যাঁ?
–আমি ফিরে আসব।
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–আমি অপেক্ষা করব।
–কতদিন?
–যতদিন লাগে।
–যদি অনেক দেরি হয়?
নিতাই শান্ত গলায় বলল–
–কিছু প্রতীক্ষার শেষ হয় না।
সেগুলোই জীবনের আশীর্বাদ।
ট্রেন চলতে শুরু করল।
জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গৌরী দেখল–
শিলপুকুর,
কাশফুল,
মাটির বাড়ি,
কুমোরপাড়া,
মা,
সাকিলা,

মাস্টারমশাই–
সব ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।
আর প্ল্যাটফর্মের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা নিতাই–
ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখের জলে।
তবু তার ঠোঁটে মৃদু হাসি।
কারণ–
ভালোবাসা কখনো বেঁধে রাখে না।
ভালোবাসা মুক্তি দেয়।
আর দূরে, কোথাও যেন হরনাথ পালের আশীর্বাদ ভেসে এলো–
"যা মা, তোর আকাশ আরও বড় হোক।"
গৌরী জানত না–
শহর তাকে শুধু শিক্ষা দেবে না।
দেবে নতুন সম্পর্ক,
নতুন সংগ্রাম,
নতুন অপমান,
নতুন সম্মান–
আর একদিন,
সেই শহর থেকেই শুরু হবে
"কুমোরপাড়ার দুর্গা"-র প্রকৃত জাগরণ।
– সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

অষ্টাদশ অধ্যায়
অচেনা শহর, নতুন আকাশ
"নতুন পথ মানেই শুধু আনন্দ নয়, নতুন পথ মানেই নতুন পরীক্ষা। যে স্বপ্ন নিয়ে ঘর ছাড়ে, তার সঙ্গী হয় একাকীত্ব, আর পথ দেখায় আশা।"
পৌষ মাসের এক শীতল সকাল।
ট্রেন ধীরে ধীরে শহরের স্টেশনে ঢুকল।
গৌরী জানালার বাইরে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত।
এত মানুষ!
এত আলো!
এত শব্দ!
কোথাও রিকশার ঘন্টা, কোথাও বাসের হর্ন, কোথাও আবার অজস্র মানুষের ব্যস্ত ছুটে চলা।
শিলপুকুরের শান্ত পুকুরপাড় আর কাশবনের নিস্তব্ধতা থেকে যেন একেবারে অন্য এক পৃথিবীতে এসে পড়েছে সে।
হরিচরণ মাস্টারমশাইয়ের এক ছাত্র, অধ্যাপক শচীন সেন, তাকে কলেজের হোস্টেলে পৌঁছে দিলেন।
ছোট্ট একটা ঘর।
একটা লোহার খাট।
একটা টেবিল।
আর জানলার ওপাশে বিশাল শহরের কোলাহল।
রাতে শুয়ে শুয়ে গৌরীর মনে পড়ল–
মা এখন কী করছেন?
সাকিলা কি তাকে মনে করছে?
আর–
শিলপুকুরের ধারে নিতাই?
তার চোখ ভিজে উঠল।
বালিশের নিচে রাখা বাবার কলমটা বুকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

কলেজে প্রথম দিন।

বিশাল ভবন।

নতুন নতুন মুখ।

অনেকে শহুরে পোশাক পরে এসেছে।

কারও হাতে দামি বই।

কারও মুখে ইংরেজি ভাষার ঝরনা।

সাধারণ সুতির শাড়ি পরে গৌরী এক কোণে চুপচাপ বসে রইল।

সেই সময় তার পাশে এসে বসল এক মেয়ে।

–তুমি নতুন?

–হ্যাঁ।

–আমি মেঘলা।

তুমি?

–গৌরী।

–কোথাকার?

–কুমোরপাড়া।

মেঘলা মুচকি হেসে বলল–

–আজ থেকে আমরা বন্ধু।

দীর্ঘদিন পরে নতুন এক বন্ধুর স্পর্শে গৌরীর মনটা একটু হালকা হয়ে গেল।

কিন্তু সবাই মেঘলার মতো ছিল না।

অনীতা নামের এক ধনী পরিবারের মেয়ে তার সাধারণ পোশাক দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল–

–গ্রাম থেকে এসে কলেজে পড়তে এসেছে!

পাশের কয়েকজন হেসে উঠল।

গৌরী চুপ করে রইল।

হরনাথ পালের শিক্ষা তাকে অপমানের উত্তরে অপমান করতে শেখায়নি।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অধ্যাপকরা লক্ষ্য করলেন–

এই শান্ত মেয়েটির অসাধারণ মেধা।

ইতিহাসের ক্লাসে অধ্যাপক অরিন্দম বসু প্রশ্ন করলেন–

–পাল যুগের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কে বলবে?

পুরো ক্লাস নীরব।

গৌরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

এক নিঃশ্বাসে উত্তর দিয়ে গেল।

ক্লাস নিস্তব্ধ।

অধ্যাপক মুগ্ধ।

–তোমার নাম?

–গৌরী পাল।

–খুব ভালো।

পড়াশোনা চালিয়ে যাও।

একদিন অনেক বড় হবে।

অনীতা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

যাকে সে গ্রাম্য মেয়ে বলে অবজ্ঞা করেছিল, সেই মেয়েটিই সবার প্রশংসা কুড়িয়ে নিল।

কিন্তু দারিদ্র্য এখনও তার পিছু ছাড়েনি।

বৃত্তির টাকা আসতে দেরি হচ্ছে।

হোস্টেলের খরচ।

বই কেনা।
খাওয়ার ব্যবস্থা–
সব মিলিয়ে গৌরী চিন্তায় পড়ে গেল।
রাতে অনেক সময় শুধু জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।
মাকে কিছু জানায় না।
চিঠিতে শুধু লেখে–
"আমি খুব ভালো আছি মা।"
গঙ্গা দেবী সেই চিঠি পড়ে চোখের জল মুছে হাসেন।
আর দূরে কুমোরপাড়ায়–
নিতাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় শিলপুকুরের ধারে বসে।
তার হাতে গৌরীর শেষ চিঠি।
প্রতিদিন সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে–
"আজ ও কী খেয়েছে?"
"পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে তো?"
কখনো কখনো গঙ্গা দেবীর জন্য বাজার করে দেয়।
মাটির চাকা ঘোরায়।
হরনাথ পালের অসমাপ্ত কাজগুলো নিজের কাজের মতো করে করে।
কিন্তু কারও কাছে নিজের মনের কথা বলে না।
একদিন রাতে গৌরী হোস্টেলের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল।
আকাশভরা তারা।
শীতের বাতাস।
হঠাৎ তার মনে হলো–
এই একই আকাশ তো শিলপুকুরের উপরেও আছে।
হয়তো এই মুহূর্তে নিতাইও সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।
তার অজান্তেই ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।
মনে মনে বলল–
"ছায়াসঙ্গী, আমি কথা রেখেছি। আমি লড়ছি।"
আর বহু দূরে, শিলপুকুরের ঘাটে বসে নিতাইও যেন নিঃশব্দে বলল–
"আমি অপেক্ষা করছি।"
কিন্তু শহরের এই নতুন আকাশের নীচে–
গৌরীর জীবনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে চলেছে এক নতুন মানুষ।
এক নতুন সম্পর্ক।
এক নতুন পরীক্ষা।
যেখানে শুধু মেধা নয়–
তার হৃদয়, আদর্শ আর অতীত–
সবকিছুরই পরীক্ষা হবে।
কারণ–
নিয়তির খাতা এখনও অনেক বাকি।
– অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ঊনবিংশ অধ্যায়
নতুন বন্ধু, নতুন পরীক্ষা
"মানুষের জীবনে নতুন মানুষের আগমন যেমন আশীর্বাদ, তেমনি নতুন পরীক্ষার সূচনাও। যে হৃদয় মাটির গন্ধ ভুলে না, পৃথিবীর কোনো ঝড়ই তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না।"

মাঘ মাসের শীত তখন ধীরে ধীরে কমছে।
শহরের কলেজজীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে গৌরী।
ভোরে উঠে পড়াশোনা, তারপর ক্লাস, লাইব্রেরি, রাতে হোস্টেলের ছোট্ট ঘরে ফিরে আবার বই।
কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যেও কখনো কখনো জানলার বাইরে তাকিয়ে তার মনে পড়ে–
শিলপুকুরের জল,
কাশফুল,
মায়ের মুখ,
আর সেই নীরব ছায়াসঙ্গী নিতাই।
কলেজের অধ্যাপক অরিন্দম বসু ধীরে ধীরে গৌরীর প্রতি স্নেহশীল হয়ে উঠলেন।
একদিন ক্লাস শেষে ডাকলেন–
–গৌরী, একটু এসো।
–জি স্যার।
–তুমি কি লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাও?
–জি।
–গবেষণার বই পড়তে ভালো লাগে?
–খুব।
অরিন্দমবাবু মুগ্ধ হয়ে বললেন–
–তোমার মধ্যে আগুন আছে।
সুযোগ পেলে অনেক দূর যাবে।
গৌরী মাথা নিচু করে বলল–
–সবই শিক্ষকদের আশীর্বাদ।
বৃদ্ধ অধ্যাপক মৃদু হেসে বললেন–
–না মা, এটা তোমার পরিশ্রম।
এদিকে মেঘলার সঙ্গে বন্ধুত্ব গভীর হয়ে উঠল।
মেঘলা শহুরে মেয়ে হলেও হৃদয়ে ছিল সরলতা।
একদিন হোস্টেলের ঘরে এসে বলল–
–তুই কখনো নিজের কথা বলিস না কেন?
–কী বলব?
–তোর গ্রামের কথা।
গৌরীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
সে বলতে লাগল–
শিলপুকুরের কথা,
বাবার মাটির চাকার কথা,
মায়ের সংগ্রাম,
সাকিলার বন্ধুত্ব,
আর–
নিতাইয়ের কথা।
মেঘলা মুচকি হেসে বলল–
–ছায়াসঙ্গী?
গৌরী লজ্জা পেয়ে বলল–
–শুধু বন্ধু।
মেঘলা হেসে উঠল।
–সব বড় ভালোবাসাই বন্ধুত্ব দিয়ে শুরু হয়।
গৌরী উত্তর দিল না।
জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু অনীতা এখনও তাকে সহ্য করতে পারছিল না।
কারণ পরীক্ষায় বারবার গৌরী প্রথম হচ্ছে।
একদিন ক্যান্টিনে বসে অনীতা বিদ্রূপ করে বলল–
–গ্রামের মেয়েরা এত ভালো পড়ে কী করে?
মেঘলা প্রতিবাদ করল।
–মেধার কোনো শহর-গ্রাম হয় না।
অনীতা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল–
–বেশি অহংকার ভালো নয়।
গৌরী শান্ত গলায় বলল–
–অহংকার নয়, পরিশ্রম।
অনীতা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।
কিন্তু তার চোখে ঈর্ষার আগুন আরও তীব্র হয়ে উঠল।
সেই সময় কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে।
ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করছে ছাত্রনেতা অরূপ সেন।
অরূপ পড়াশোনায় ভালো, বক্তৃতায় দক্ষ, আর মানুষের জন্য কাজ করতে ভালোবাসে।
একদিন লাইব্রেরিতে গৌরীকে দেখে সে বলল–
–আপনি গৌরী পাল?
–জি।
–আপনার কথা অনেক শুনেছি।
–আমার কথা?
–স্যাররা বলেন, আপনি অসাধারণ মেধাবী।
গৌরী মৃদু হাসল।
–আমি শুধু পড়াশোনা করি।
অরূপ বলল–
–কলেজে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটা তহবিল গড়ছি।
আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন?
গৌরী অবাক।
–আমি?
–হ্যাঁ।
যে মানুষ দুঃখ চেনে, সে-ই অন্যের দুঃখ বোঝে।
কথাগুলো শুনে গৌরীর মনে পড়ে গেল বাবার কথা।
মাস্টারমশাইয়ের কথা।
নিতাইয়ের ত্যাগ।
সে ধীরে বলল–
–মানুষের কাজে থাকতে পারলে ভালো লাগবে।
কিন্তু সেই রাতেই বিপদ এল।
হোস্টেলের ফি বাকি।
সুপারিন্টেনডেন্ট কঠোর গলায় বললেন–
–আর এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা না দিলে হোস্টেল ছাড়তে হবে।
গৌরীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।
বৃত্তির টাকা এখনও আসেনি।
মাকে বলবে?
না।

গঙ্গা দেবী আরও কষ্ট পাবেন।
সারারাত সে ঘুমোতে পারল না।
বাবার কলমটা হাতে নিয়ে ফিসফিস করে বলল–
–বাবা, আমি কি হেরে যাব?
ঠিক সেই সময় জানলার বাইরে পূর্ণিমার আলো এসে পড়ল।
আর বহু দূরে–
শিলপুকুরের ধারে বসে নিতাই অকারণে অস্থির হয়ে উঠল।
মনে হলো–
গৌরী যেন কষ্টে আছে।
সে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল–
"হে ভগবান, ওকে শক্তি দিও।"
কিন্তু নিয়তি তখন আরও এক নতুন চরিত্রকে গৌরীর জীবনের দিকে এগিয়ে আনছে।
ছাত্রনেতা অরূপ–
যে একদিন গৌরীর জীবনে বন্ধুত্ব, সংগ্রাম, সম্মান–
আর এক জটিল মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে উঠবে।
আর দূরে–
নিতাইয়ের নীরব প্রতীক্ষার পরীক্ষা আরও কঠিন হবে।
– ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

বিংশ অধ্যায়
ঝড়ের আগে আলো
"কখনো কখনো জীবনের সবচেয়ে কঠিন রাতের আগে একটুকরো আলো এসে পথ দেখায়। কিন্তু সেই আলোই আবার মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করে নতুন দ্বন্দ্ব।"
ফাল্গুন মাস।
শীতের বিদায়, বসন্তের আগমন।
কলেজ চত্বরে কৃষ্ণচূড়া আর শিমুল ফুলের রঙিন সমারোহ। চারদিকে নতুন পাতার গন্ধ, নতুন স্বপ্নের আবেশ।
কিন্তু গৌরীর জীবনে বসন্তের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে।
হোস্টেলের বকেয়া ফি, বইয়ের দাম, প্রতিদিনের খরচ–সব মিলিয়ে সে গভীর দুশ্চিন্তায়।
সারারাত ঘুম হয় না।
চোখের নিচে কালো ছাপ পড়েছে।
মেঘলা একদিন বলল–
–তুই এত শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন?
–কিছু না।
–আমার কাছে লুকাবি?
গৌরীর চোখে জল এসে গেল।
–হোস্টেলের টাকা বাকি।
এক সপ্তাহের মধ্যে না দিলে বেরিয়ে যেতে হবে।
মেঘলা তার হাত চেপে ধরল।
–কিছু একটা উপায় হবেই।
পরদিন লাইব্রেরিতে বসে পড়ছিল গৌরী।
হঠাৎ অরূপ এসে বলল–
–আপনি খুব চিন্তায় আছেন?
–না, কিছু না।
–মানুষের মুখ মিথ্যে বলতে পারে, চোখ পারে না।

গৌরী চুপ করে রইল।
অরূপ ধীরে বলল–
–আপনি কি আমাকে বন্ধু মনে করেন?
–হ্যাঁ।
–তাহলে বলুন।
অনেক দ্বিধার পরে গৌরী সব কথা খুলে বলল।
অরূপ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।
তারপর বলল–
–ছাত্রকল্যাণ তহবিলে কিছু টাকা আছে।
আমি চেষ্টা করি।
গৌরী তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল।
–না, দয়া আমি নিতে পারব না।
অরূপ মৃদু হেসে বলল–
–এটা দয়া নয়।
এটা একজন ছাত্রের অধিকারের টাকা।
মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ালে তাকে করুণা বলে না।
গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল অনীতা।
তার ঠোঁটে কুটিল হাসি ফুটে উঠল।
সেই সন্ধ্যাতেই কয়েকজনকে বলল–
–বুঝলে? গ্রামের মেয়েটা এখন ছাত্রনেতার খুব কাছের মানুষ।
পরদিন কলেজে গুজব ছড়িয়ে পড়ল।
গৌরী আবার অনুভব করল–
সমাজ বদলালেও মানুষের কুৎসা বদলায় না।
মেঘলা রাগে ফেটে পড়ল।
–মানুষ এত নীচ হতে পারে?
গৌরী শুধু বলল–
–আমার জীবনে অপবাদ নতুন নয়।
এদিকে বহু দূরে কুমোরপাড়ায়।
সন্ধ্যা।
শিলপুকুরের ঘাটে বসে নিতাই গৌরীর চিঠি পড়ছে।
চিঠিতে লেখা–
"মা কেমন আছে দেখে যাস। আর তুই নিজের শরীরের খেয়াল রাখিস।"
চিঠিতে নিজের কষ্টের কথা একটাও লেখেনি গৌরী।
কিন্তু নিতাই যেন অনুভব করল–
কোথাও কিছু সমস্যা হয়েছে।
সেই রাতে গঙ্গা দেবীর কাছে গিয়ে বলল–
–কাকিমা, গৌরী কি কোনো কষ্টে আছে?
গঙ্গা দেবী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
–কিছু বলে না।
কিন্তু মায়ের মন বলছে, মেয়েটা কষ্টে আছে।
নিতাই সারা রাত ঘুমোতে পারল না।
পরদিন ভোরে সে নিজের জমির এক টুকরো অংশ বন্ধক রাখল।

হরিপদ চক্রবর্তী অবাক হয়ে বললেন–
–কেন?
–একটু দরকার আছে বাবা।
–কী দরকার?
–একটা স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।
হরিপদবাবু ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।
কয়েকদিন পরে হরিচরণ মাস্টারমশাইয়ের মাধ্যমে গৌরীর কাছে কিছু টাকা পৌঁছল।
সঙ্গে ছোট্ট একটি চিরকুট–
"পথ যত কঠিনই হোক, থামিস না। কিছু মানুষের আশীর্বাদ সবসময় তোর সঙ্গে আছে।"
কোনো নাম নেই।
কিন্তু কাগজটা হাতে নিয়েই গৌরীর বুকটা কেঁপে উঠল।
সে ফিসফিস করে বলল–
–ছায়াসঙ্গী...
তার চোখ দুটো ভিজে উঠল।
এদিকে অরূপও গৌরীর মেধা, সততা আর সংগ্রামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করতে শুরু করেছে।
একদিন কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে মেঘলাকে বলল–
–গৌরীর মতো মানুষ আজকাল খুব কম দেখা যায়।
মেঘলা মৃদু হেসে বলল–
–সাবধানে থাকবেন।
ওর হৃদয়ের এক অংশ বহু দূরে শিলপুকুরের ধারে রেখে এসেছে।
অরূপ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল।
সেই রাতে গৌরী হোস্টেলের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল।
আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।
তার মনে হচ্ছিল–
এই একই চাঁদ এখন শিলপুকুরের জলে পড়ছে।
হয়তো নিতাইও তাকিয়ে আছে।
হঠাৎ তার মনে এক অদ্ভুত দ্বিধার জন্ম হলো।
একদিকে–
নিতাইয়ের নীরব ভালোবাসা।
অন্যদিকে–
অরূপের বন্ধুত্ব, সম্মান আর সহমর্মিতা।
আর মানুষের হৃদয় তো নদীর মতো–
তার গভীরতাও অনেক সময় সে নিজেই বুঝতে পারে না।
কিন্তু নিয়তি তখন আরও বড় এক ঝড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
কারণ–
কলেজ রাজনীতি, অনীতার ষড়যন্ত্র, আর সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তবতা–
খুব শীঘ্রই গৌরীকে দাঁড় করাবে জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সামনে।
– বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

একবিংশ অধ্যায়
আগুনের পরীক্ষা

"সোনা আগুনে পুড়েই খাঁটি হয়। মানুষও তেমনি– দুঃখ, অপমান আর সংগ্রামের আগুনে নিজের প্রকৃত শক্তিকে চিনতে শেখে।"
চৈত্র মাস।
বসন্ত বিদায় নিচ্ছে।

কলেজ চত্বরে কৃষ্ণচূড়ার আগুনরঙা ফুল ফুটেছে। কিন্তু গৌরীর জীবনে যেন অন্য এক আগুনের শুরু।
কলেজ ছাত্র সংসদের উদ্যোগে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
অরূপ, মেঘলা, গৌরী–সবাই ব্যস্ত।
অরূপ বলল–
–গৌরী, তুমি উদ্বোধনী বক্তৃতা করবে।
গৌরী অবাক।
–আমি?
–হ্যাঁ। তোমার জীবনের সংগ্রামের কথা অন্যদের অনুপ্রেরণা দেবে।
গৌরী লজ্জায় মাথা নিচু করল।
–আমি তো সাধারণ মানুষ।
অরূপ হেসে বলল–
–সাধারণ মানুষই একদিন অসাধারণ হয়।
কিন্তু অনীতার চোখে তখন ঈর্ষার আগুন।
অরূপের প্রশংসা, শিক্ষকদের স্নেহ, ছাত্রছাত্রীদের সম্মান–সবকিছুই তার সহ্য হচ্ছিল না।
সে কয়েকজনকে নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করল।
একদিন কলেজের নোটিশ বোর্ডে একটি কুৎসিত বেনামী চিঠি দেখা গেল।
তাতে লেখা–
"গৌরী পাল ছাত্রনেতা অরূপের সাহায্যে কলেজে নিজের প্রভাব বাড়াচ্ছে। তাদের সম্পর্ক শিক্ষার নয়, অন্য কিছু।"
মুহূর্তে আগুনের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ল।
করিডরে ফিসফিসানি।
ক্যান্টিনে বিদ্রূপ।
অনেকেই সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল।
গৌরীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।
আবার?
আবার সেই অপবাদ?
সে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইল।
মেঘলা ছুটে এসে দেখল, গৌরী বাবার কলমটা বুকে চেপে ধরে কাঁদছে।
–গৌরী!
–আমি কি এতই খারাপ মেঘলা?
–পাগলী! মানুষ নিজের নীচতা দিয়ে অন্যকে মাপে।
–আমি ক্লান্ত।
মেঘলা তাকে জড়িয়ে ধরল।
–না, তুই ভাঙবি না।
পরদিন কলেজে উত্তেজনা।
অধ্যাপক অরিন্দম বসু ক্ষুব্ধ।
–এটা শুধু একজন ছাত্রীর অপমান নয়, শিক্ষার অপমান।
অরূপ সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল–
–যে এই কাজ করেছে, সে কাপুরুষ।
যদি সাহস থাকে, সামনে আসুক।
ঠিক তখনই অনীতা দাঁড়িয়ে বলল–
–সবাই যা বলছে, তা কি মিথ্যে?
অরূপের চোখে আগুন জ্বলে উঠল।
–মিথ্যা!

আর একজন নারীর সম্মান নিয়ে খেলা করা পাপ।

পুরো হলঘর স্তব্ধ।

গৌরী চোখে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল।

–আমি গরিব হতে পারি।

গ্রামের মেয়ে হতে পারি।

কিন্তু আমার আত্মসম্মান বিক্রি করিনি।

আমার জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে আছে আমার বাবা, আমার মা, আমার শিক্ষক, আমার বন্ধুদের ত্যাগ।

যারা মিথ্যে বলে, তারা সত্যকে অপমান করতে পারে–

পরাজিত করতে পারে না।

কথাগুলো শুনে করতালিতে ফেটে পড়ল হলঘর।

অনীতার মুখ ফ্যাকাশে।

অধ্যাপক অরিন্দম কঠিন গলায় বললেন–

–অনীতা, তুমি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত।

সে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু এই ঘটনার খবর কোনোভাবে পৌঁছে গেল কুমোরপাড়ায়।

গঙ্গা দেবী সারারাত কেঁদে কাটালেন।

আর নিতাই?

তার বুকের ভিতর অজানা অস্থিরতা।

হরিচরণ মাস্টারমশাই শুধু বললেন–

–মেয়েটা খুব কষ্টে আছে।

সেই রাতেই নিতাই সিদ্ধান্ত নিল।

–আমি শহরে যাব।

হরিপদ চক্রবর্তী বিস্মিত।

–এখন?

–হ্যাঁ বাবা।

কিছু সম্পর্কের পাশে দাঁড়াতে দেরি করা পাপ।

দুই দিন পর।

গৌরী হোস্টেলের বারান্দায় বসে।

চোখ দুটো লাল।

হঠাৎ মেঘলা দৌড়ে এসে বলল–

–গৌরী!

–কী হয়েছে?

–তোর গ্রামের কেউ এসেছে।

গৌরীর বুক ধক করে উঠল।

সে নিচে নেমে এল।

দেখল–

ধুলো মাখা কাপড়।

ক্লান্ত মুখ।

হাতে ছোট্ট একটি ব্যাগ।

আর সেই পরিচিত দুটি চোখ।

নিতাই।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কথা বলতে পারল না।

গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
–তুই?
নিতাই শুধু মৃদু হেসে বলল–
–ছায়া কি এত দূর থেকেও পাশে থাকতে পারে না?
গৌরী আর নিজেকে সামলাতে পারল না।
চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।
অনেক অপমান, অনেক কষ্ট, অনেক একাকীত্বের পরে–
আজ যেন শিলপুকুরের হাওয়া এসে ছুঁয়ে গেল তাকে।
কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল আর একজন।
অরূপ সেন।
তার চোখে বিস্ময়।
আর কোথাও এক গভীর নিঃশব্দ প্রশ্ন–
এই মানুষটি কে?
আর কেন গৌরীর চোখে তাকে দেখে এমন আলো জ্বলে উঠল?
– একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

দ্বাবিংশ অধ্যায়
দুই পথের সঙ্গী
"নদীর দুই তীর আলাদা হলেও, তাদের বুকে একই জল বয়ে যায়। মানুষের পথ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের মহত্বই মানুষকে এক করে।"
বৈশাখের শুরু।
শহরের গাছে গাছে কৃষ্ণচূড়ার আগুনরঙা ফুল। দুপুরের রোদে রাস্তা জ্বলছে, কিন্তু গৌরীর হৃদয়ে আজ এক অদ্ভুত শান্তি।
অনেকদিন পরে নিজের মানুষের মুখ দেখেছে সে।
নিতাই।
কুমোরপাড়ার মাটির গন্ধ মাখা সেই ছেলেটি।
হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে নিতাই লাজুক হাসি দিয়ে বলল–
–ভালো আছিস?
গৌরী চোখের জল সামলে বলল–
–তুই এত দূর এলি?
–মন বলল, চলে আসি।
মেঘলা মুচকি হেসে সব দেখছিল।
সে বুঝতে পারল–
এই মানুষটা শুধু বন্ধু নয়।
এই সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে গভীর আত্মার বন্ধন।
ঠিক তখনই সামনে এসে দাঁড়াল অরূপ।
–গৌরী, উনি?
গৌরী একটু থেমে বলল–
–আমার ছায়াসঙ্গী।
আমার গ্রামের মানুষ।
আমার সবচেয়ে আপন বন্ধু।
অরূপ এগিয়ে এসে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিল।
–আমি অরূপ সেন।
নিতাই একটু সংকোচ নিয়ে হাত বাড়াল।
–নিতাই চক্রবর্তী।
অরূপ বলল–

–আপনার কথা গৌরীর মুখে অনেক শুনেছি।
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–আমিও।
গৌরীর অনেক চিঠিতে আপনার কথা আছে।
অরূপ বিস্মিত হয়ে গৌরীর দিকে তাকাল।
গৌরী লজ্জায় মাথা নিচু করল।
সন্ধ্যায় তিনজনে কলেজের বাগানে বসেছিল।
মেঘলাও এসে যোগ দিল।
অরূপ বলল–
–আপনি কী করেন?
–চাষবাস।
বাবার সঙ্গে কাজ করি।
–পড়াশোনা?
–ছেড়ে দিয়েছি।
গৌরী চমকে উঠল।
–ছেড়ে দিয়েছিস?
নিতাই হাসল।
–সব স্বপ্ন নিজের জন্য হয় না।
কিছু স্বপ্ন অন্যের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে হয়।
গৌরীর বুকটা হুহু করে উঠল।
সে বুঝতে পারল–
যে মানুষটি কখনো নিজের ভালোবাসার কথা বলেনি,
সে নিজের জীবনটাই তার স্বপ্নের পায়ে উৎসর্গ করে দিয়েছে।
অরূপ চুপচাপ শুনছিল।
তার চোখে শ্রদ্ধার ছায়া।
–আপনার মতো মানুষ খুব কম দেখা যায়।
নিতাই হেসে বলল–
–আমি খুব সাধারণ মানুষ।
অরূপ মাথা নাড়ল।
–না।
সাধারণ মানুষ এত বড় ত্যাগ করতে পারে না।
এদিকে অনীতা নিজের ভুল বুঝতে শুরু করেছে।
অধ্যাপক অরিন্দম বসুর কাছে মাথা নিচু করে বলল–
–স্যার, আমি অন্যায় করেছি।
অরিন্দমবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
–ভুল মানুষ করে।
কিন্তু অনুতাপ মানুষকে বড় করে।
অনীতা কেঁদে ফেলল।
–আমি গৌরীর কাছে ক্ষমা চাইতে চাই।
পরদিন সে গৌরীর সামনে এসে দাঁড়াল।
–আমাকে ক্ষমা করবে?
গৌরী শান্ত চোখে তাকিয়ে রইল।
–ক্ষমা করতে না পারলে আমি নিজেও ছোট হয়ে যাব।

অনীতা কাঁদতে কাঁদতে বলল–
–আমি তোমার মতো হতে পারলাম না।
গৌরী মৃদু হাসল।
–মানুষ একদিনে বড় হয় না।
শুধু ভুল বুঝতে পারলেই বড় হওয়ার শুরু হয়।
সেই সময় কলেজের আশেপাশের বস্তি এলাকার কয়েকজন দরিদ্র শিশু পড়াশোনা ছেড়ে কাজে নামছে–এই খবর পেয়ে অরূপ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।
সে বলল–
–কিছু একটা করা দরকার।
মেঘলা বলল–
–আমরা সন্ধ্যায় ওদের পড়াতে পারি।
গৌরীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
–বাবা বলতেন, বিদ্যা শুধু নিজের জন্য নয়।
নিতাইও বলল–
–আমার সামর্থ্য কম।
তবে যতটুকু পারি সাহায্য করব।
চারজনের চোখে তখন নতুন স্বপ্ন।
একটি বিনামূল্যের পাঠশালা।
দরিদ্র শিশুদের জন্য।
মানুষের জন্য।
সেই রাতে হোস্টেলের ছাদে একা দাঁড়িয়ে ছিল গৌরী।
নিচে শহরের হাজার আলো।
আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।
কিন্তু তার হৃদয়ে আজ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব।
অরূপ–
যে তাকে সম্মান করে, বুঝতে পারে, তার সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে।
আর নিতাই–
যে কিছু না চেয়েও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে তার জীবনের প্রতিটি অন্ধকারে প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে।
দুটি পথ।
দুটি হৃদয়।
কিন্তু গৌরীর হৃদয়?
সে নিজেও যেন উত্তর জানে না।
আর ঠিক তখনই–
দূরে কোথাও নিয়তি নীরবে আর এক ঝড়ের প্রস্তুতি নিতে লাগল।
কারণ–
মানুষের জীবনে শুধু প্রেমের পরীক্ষা আসে না।
আসে কর্তব্যের পরীক্ষা।
আসে জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা।
আর খুব শীঘ্রই–
গঙ্গা দেবীর অসুস্থতার খবর
সবকিছু বদলে দিতে চলেছে।
– দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মায়ের ডাক

"পৃথিবীর সমস্ত ডাকের মধ্যে মায়ের ডাকে সবচেয়ে বেশি ব্যাকুলতা থাকে। যে মানুষ হাজার মানুষের ভালোবাসা পায়, সেও মায়ের একফোঁটা অশ্রুর কাছে পরাজিত হয়ে যায়।"

জ্যৈষ্ঠ মাস।

শহরের আকাশ আগুন ঝরাচ্ছে।

বিকেলের দিকে কালবৈশাখীর কালো মেঘ জমছে। কলেজের কাজ, বস্তির শিশুদের নিয়ে নতুন পাঠশালার পরিকল্পনা–সব মিলিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে গৌরীর জীবন।

অরূপ, মেঘলা আর নিতাই মিলে সন্ধ্যায় ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর ভাড়া নিয়ে দশ-বারোটি দরিদ্র শিশুকে পড়ানো শুরু করেছে।

শিশুগুলোর মুখে হাসি ফুটতে দেখে গৌরীর মনে হতো–

হরনাথ পালের স্বপ্ন যেন একটু একটু করে পূরণ হচ্ছে।

ঠিক সেই সময় এক বিকেলে হোস্টেলের দারোয়ান এসে বলল–

–গৌরী, তোমার গ্রামের চিঠি এসেছে।

চিঠিটা হাতে নিয়েই গৌরীর বুক কেঁপে উঠল।

হরিচরণ মাস্টারমশাইয়ের লেখা–

"মা, ভয় পাস না। কিন্তু তোর মা কয়েকদিন ধরে খুব অসুস্থ। যদি পারিস, একবার চলে আয়।"

চিঠির শেষ লাইনটা পড়তেই গৌরীর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল।

–মা!

চিঠিটা বুকে চেপে সে মেঝেতে বসে পড়ল।

অরূপ ছুটে এল।

–কী হয়েছে?

গৌরী কাঁদতে কাঁদতে চিঠিটা এগিয়ে দিল।

সব পড়ে অরূপ বলল–

–আজই রওনা হও।

–কিন্তু টাকা?

–সেটা আমি দেখছি।

ঠিক তখনই নিতাই চুপচাপ এসে দাঁড়াল।

চিঠির কথা শুনেই তার মুখ শুকিয়ে গেল।

–কাকিমার কিছু হবে না।

চল, আজই ফিরি।

অরূপ অবাক হয়ে বলল–

–আপনিও যাবেন?

নিতাই মৃদু হেসে বলল–

–ও একা যাবে?

কথাটা শুনে অরূপের চোখে শ্রদ্ধার ছায়া ফুটে উঠল।

সেই রাতের ট্রেন।

জানলার বাইরে অন্ধকার।

গৌরীর চোখে ঘুম নেই।

একদিকে অরূপ।

অন্যদিকে নিতাই।

দুজনেই নীরবে তার পাশে।

কেউ কোনো বড় কথা বলছে না।

কিন্তু দুজনের চোখেই উদ্বেগ।

মেঘলা বিদায়ের সময় শুধু বলেছিল–

–মাকে নিয়ে ফিরে আসবি।

ভোরে ট্রেন পৌঁছল।

স্টেশন থেকে নেমে কুমোরপাড়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে গৌরীর বুক ধড়ফড় করছে।

শিলপুকুর।

কাশবন।

বটগাছ।

সব যেন আগের মতোই আছে।

শুধু সময় বদলেছে।

গঙ্গা দেবীকে দেখে গৌরীর বুক ফেটে গেল।

একসময়ের শক্ত, কর্মঠ মানুষটি আজ শয্যাশায়ী।

মুখ শুকিয়ে গেছে।

চোখদুটো কোটরে ঢুকে গেছে।

গৌরী মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল–

–মা!

গঙ্গা দেবী কাঁপা হাতে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন।

–এসেছিস মা?

–তুমি আমাকে ডাকোনি কেন?

–তোকে কষ্ট দিতে চাইনি।

নিতাই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিল।

অরূপও নিঃশব্দে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকদিন ধরে ডাক্তার, ওষুধ, সেবা–সবকিছুতেই নিতাই আর অরূপ একসঙ্গে ছুটে বেড়াতে লাগল।

রশিদ মিঞা একদিন হেসে বললেন–

–দেখো দেখি, শহরের ছেলে আর গ্রামের ছেলে যেন দুই ভাই হয়ে গেছে!

হরিচরণ মাস্টারমশাই আবেগে বললেন–

–মানুষের সম্পর্ক রক্তে নয়, হৃদয়ে বাঁধা থাকে।

এক সন্ধ্যায় শিলপুকুরের ঘাটে বসেছিল অরূপ আর নিতাই।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

আকাশ লাল।

অরূপ ধীরে বলল–

–নিতাইদা, আপনি গৌরীকে খুব ভালোবাসেন, তাই না?

নিতাই একটু চমকে উঠল।

তারপর মৃদু হেসে বলল–

–ভালোবাসা কি সবসময় মুখে বলতে হয়?

–না।

–আমি শুধু চাই, ও সুখে থাকুক।

অরূপ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

–আমিও তাই চাই।

দুজনেই চুপ করে রইল।

শিলপুকুরের জলে তখন সন্ধ্যাতারা কাঁপছে।

দুই পুরুষ।

দুই হৃদয়।

কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়।

শুধু একজন মানুষের মঙ্গল কামনা।

এক রাতে গঙ্গা দেবী গৌরীকে কাছে ডাকলেন।
—মা।
—বল মা।
—তোর বাবা একটা কথা বলতেন।
—কী কথা?
—মানুষ বড় হয় শুধু নিজের জন্য নয়।
অন্যের জন্য বাঁচতে শিখলে তবেই জীবন সার্থক।
গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
—হ্যাঁ মা।
—আমার একটা স্বপ্ন আছে।
—কী?
—তোর বাবা চেয়েছিল, এই কুমোরপাড়ায় একটা স্কুল হোক।
যেখানে গরিবের ছেলে-মেয়েরা বিনা পয়সায় পড়বে।
আমি হয়তো আর দেখতে পাব না...
—মা!
গঙ্গা দেবী মৃদু হাসলেন।
—কাঁদিস না।
তুই পারবি।
তুই হরনাথ পালের মেয়ে।
সেই রাতে বাবার পুরোনো মাটির চাকার সামনে দাঁড়িয়ে গৌরী আকাশের দিকে তাকাল।
চাঁদের আলোয় তার চোখ দুটো ভিজে উঠেছে।
সে মনে মনে বলল—
*"বাবা, তোমার স্বপ্ন শুধু আমার নয়। এখন সেটা আমার জীবনের ধর্ম।
আমি মানুষ গড়ব। আমি আলো জ্বালাব।"*
কিন্তু নিয়তি এখনও শেষ কথা বলেনি।
কারণ—
গঙ্গা দেবীর অসুস্থতা সাময়িকভাবে কমলেও,
এক ভয়ংকর সত্য ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।
আর সেই সত্য—
গৌরীর জীবনকে চিরদিনের জন্য বদলে দেবে।
— ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

চতুর্বিংশ অধ্যায়
শেষ আশীর্বাদ
"মানুষ চলে যায়, কিন্তু তার স্বপ্ন মরে না। প্রিয়জনের বিদায় অশ্রু নিয়ে আসে, আর তাদের আদর্শ হয়ে ওঠে পথের প্রদীপ।"
আষাঢ় মাস।
আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা।
শিলপুকুরের জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ছোট ছোট বৃত্ত তৈরি করছে। কুমোরপাড়ার মাটির পথ ভিজে নরম হয়ে গেছে।
গঙ্গা দেবীর শরীর দিন দিন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে।
ডাক্তার এসে শুধু মাথা নেড়ে চলে যান।
হরিচরণ মাস্টারমশাই, রশিদ মিঞা, সাকিলা, নিতাই, অরূপ—সবাই বুঝতে পারছেন, সময় যেন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে।
কিন্তু গঙ্গা দেবীর মুখে আশ্চর্য শান্তি।
একদিন বিকেলে তিনি গৌরীকে কাছে ডাকলেন।

–মা, একটু বস।

গৌরী মায়ের হাত ধরে বসে পড়ল।

–বল মা।

–ভয় পাবি না তো?

–না মা।

–আমার যাওয়ার সময় হয়েছে।

–মা!

–কাঁদিস না।

জন্ম আছে, মৃত্যু আছে।

কিন্তু মানুষের কর্ম থেকে যায়।

গৌরী মায়ের বুকের উপর মুখ রেখে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল।

–আমাকে একা রেখে যেও না।

গঙ্গা দেবী মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন–

–তুই একা হবি কেন?

তোর বাবার আশীর্বাদ আছে।

মাস্টারমশাই আছেন।

সাকিলা আছে।

নিতাই আছে।

...

একটু থেমে দরজার দিকে তাকালেন।

–ওই শহরের ছেলেটাও আছে।

অরূপ লজ্জায় মাথা নিচু করল।

গঙ্গা দেবী মৃদু হেসে বললেন–

–তোরা সবাই আমার সন্তান।

সেই রাতে তিনি নিতাইকে ডাকলেন।

–বাবা।

–জি কাকিমা।

–একটা কথা রাখবি?

–আপনার আদেশ।

–গৌরী খুব জেদি।

কষ্ট পেলে মুখে কিছু বলে না।

ওকে কখনো একা ছেড়ে যাস না।

নিতাইয়ের চোখ ভিজে উঠল।

–যতদিন বাঁচি।

তারপর অরূপকে কাছে ডাকলেন।

–বাবা।

–জি মাসিমা।

–গৌরী অনেক বড় হবে।

ওর পথ যেন মানুষের কাজে থেমে না যায়।

অরূপ কাঁপা গলায় বলল–

–আমি কথা দিচ্ছি।

পরদিন ভোরে প্রবল বৃষ্টি।

চারদিকে অন্ধকার।

গৌরী মায়ের মাথার কাছে বসে।
গঙ্গা দেবীর শ্বাস ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
হঠাৎ তিনি চোখ খুললেন।
–গৌরী।
–মা!
–তোর বাবাকে দেখতে পাচ্ছি।
গৌরীর বুক কেঁপে উঠল।
–মা!
–ভয় পাস না।
হরনাথ এসেছে।
...
আর খুব আস্তে বললেন–
–স্কুলটা করিস মা...
গরিবের ছেলে-মেয়েদের আলো দিস...
তারপর–
একটি দীর্ঘ নিশ্বাস।
একটি শান্ত হাসি।
আর সব শেষ।
বাইরে তখন প্রবল বৃষ্টি।
শিলপুকুরের জল উপচে পড়ছে।
কিন্তু গৌরীর পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে গেল।
–মা——!
তার আর্তনাদে কেঁপে উঠল কুমোরপাড়া।
সেদিন পুরো গ্রাম কেঁদেছিল।
রশিদ মিঞা চোখ মুছতে মুছতে বললেন–
–আজ যেন নিজের বোনকে হারালাম।
সাকিলা অঝোরে কাঁদছিল।
হরিচরণ মাস্টারমশাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন–
–হরনাথ, গঙ্গা, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।
তোমাদের মেয়ে আলো হয়ে বাঁচবে।
শ্মশান থেকে ফেরার পথে গৌরী নিঃশব্দ।
তার চোখে জল নেই।
শুধু অসীম শূন্যতা।
সেই রাতে বাবার মাটির চাকার পাশে বসে সে চুপচাপ।
নিতাই পাশে এসে বসে।
অরূপও নীরবে দাঁড়িয়ে।
অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না।
তারপর গৌরী ফিসফিস করে বলল–
–আমি এত একা কেন?
নিতাই ধীরে বলল–
–তুই একা নস।
অরূপ বলল–
–মানুষ কখনো একা হয় না, যদি তার স্বপ্ন থাকে।
গৌরী আকাশের দিকে তাকাল।

মেঘ সরে গেছে।
চাঁদের আলো ফুটেছে।
তার মনে হলো–
বাবা আর মা দুজনেই যেন হাসছেন।
আর কোথাও থেকে ভেসে আসছে–
"কাঁদিস না মা। কাজ শুরু কর।"
পরদিন সকালে গৌরী হরিচরণ মাস্টারমশাই, নিতাই, অরূপ, রশিদ মিঞা, সাকিলা–সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল–
–আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
বাবার স্বপ্ন পূরণ করব।
মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করব।
এই কুমোরপাড়াতেই হবে–
"হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"।
গরিবের ছেলে-মেয়েরা বিনা পয়সায় পড়বে।
কেউ অন্ধকারে থাকবে না।
হরিচরণবাবুর চোখে জল।
রশিদ মিঞা দুই হাত তুলে বললেন–
–আল্লাহ তোকে শক্তি দিন মা।
নিতাই মাথা নিচু করে হাসল।
অরূপের চোখে জ্বলল নতুন স্বপ্নের আগুন।
আর আকাশের ওপারে–
হয়তো হরনাথ পাল আর গঙ্গা দেবী আশীর্বাদের হাত বাড়িয়ে দিলেন।
কারণ–
দুঃখের সমাপ্তি নেই।
কিন্তু মানুষের আদর্শ–
মৃত্যুকেও অতিক্রম করে।
– চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
স্বপ্নের ভিত্তিপ্রস্তর
"স্বপ্ন দেখা সহজ, স্বপ্নকে মাটিতে দাঁড় করানো কঠিন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি সত্য হয়, তবে অসম্ভবও একদিন মাথা নত করে।"
শ্রাবণ মাস।
বৃষ্টিভেজা কুমোরপাড়া যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। শিলপুকুরের জল উপচে পড়ছে। দূরে ধানের ক্ষেতে সবুজের সমারোহ।
কিন্তু হরনাথ পালের বাড়িতে এখনও শোকের ছায়া।
গঙ্গা দেবীর মৃত্যুর পর বাড়িটা যেন আরও নির্জন হয়ে গেছে।
রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় গৌরীর।
মনে হয়–
মা যেন ডাকছেন–
"মা, স্কুলটা করিস..."
আর সেই ডাকই তাকে নতুন শক্তি দেয়।
একদিন সকালে হরিচরণ মাস্টারমশাই, রশিদ মিঞা, সাকিলা, নিতাই আর অরূপকে নিয়ে গৌরী বাবার পুরোনো মাটির চাকার সামনে দাঁড়াল।
–আজ থেকে শুরু হবে আমাদের কাজ।
হরিচরণবাবু জিজ্ঞেস করলেন–
–জমি কোথায়?

গৌরী চুপ।
–জমি নেই।
টাকা নেই।
কিছুই নেই।
শুধু বাবার স্বপ্ন আছে।
রশিদ মিঞা হেসে বললেন–
–স্বপ্ন থাকলে পথ বের হবেই মা।
ঠিক সেই সময় নিতাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।
–একটা কথা বলব?
–বল।
–আমাদের দক্ষিণের বাঁশবাগানের পাশের দুই বিঘা জমি...
ওটা আমি বিদ্যালয়ের জন্য দিতে চাই।
সবাই স্তব্ধ।
গৌরী বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।
–তুই পাগল হয়েছিস?
–না।
জমি মানুষকে বড় করে না।
মানুষ জমিকে বড় করে।
–কিন্তু ওটা তো তোর বাবার সম্পত্তি!
হরিপদ চক্রবর্তী এগিয়ে এসে বললেন–
–না মা।
আজ থেকে ওটা শুধু আমার নয়।
ওটা গ্রামের।
ওটা হরনাথের স্বপ্নের জমি।
গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
সে কিছু বলতে পারল না।
অরুপও চুপ করে বসে ছিল।
হঠাৎ সে ব্যাগ থেকে কিছু কাগজ বের করল।
–আমারও একটা খবর আছে।
–কী?
–কলকাতার কয়েকজন অধ্যাপক আর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছি।
একটা শিক্ষা-তহবিল তৈরি হবে।
শুরুতে খুব বেশি না হলেও...
বিদ্যালয়ের জন্য কিছু অর্থ জোগাড় করা যাবে।
হরিচরণবাবুর চোখ জলে ভরে গেল।
–হরনাথ, তুই দেখছিস তো?
তোর স্বপ্নের জন্য মানুষ নিজে থেকেই এগিয়ে আসছে।
কিন্তু সুখের পথ কখনো সহজ হয় না।
গ্রামের কিছু মানুষ আবার আপত্তি তুলল।
মনোরমা দেবী বললেন–
–এত বড় স্কুল হবে?
টাকা কোথায়?
একজন বলল–

–গরিবের ছেলে-মেয়েরা পড়ে কী হবে?
আর একজন বলল–
–মেয়েমানুষ আবার স্কুল গড়বে?
গৌরী শান্তভাবে সব শুনল।
তারপর বলল–
–যেদিন আমি পড়তে চেয়েছিলাম, তখনও এমন কথা শুনেছিলাম।
আজ আমি কাউকে জোর করব না।
যারা বিশ্বাস করেন, তারা সঙ্গে থাকবেন।
যারা করেন না, তারা আশীর্বাদ করুন।
একদিন ফল নিজেরাই দেখবেন।
সেই সন্ধ্যায় সাকিলা গ্রামের মুসলিম পাড়ায় গেল।
–এই স্কুল শুধু হিন্দুদের জন্য নয়।
সব বাচ্চাদের জন্য।
রশিদ মিঞা মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন–
–বিদ্যার কোনো ধর্ম নেই।
মানুষের ধর্ম মানুষ হওয়া।
কুমোরপাড়া ধীরে ধীরে এক নতুন স্বপ্নে জেগে উঠতে লাগল।
একদিন ভোরে শিলপুকুরের ধারে গৌরী একা দাঁড়িয়ে।
সূর্য উঠছে।
ঠিক তখন নিতাই এসে পাশে দাঁড়াল।
–কী ভাবছিস?
–ভয় করছে।
–কিসের?
–যদি না পারি?
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–তুই যখন প্রথম পড়তে গিয়েছিলি, তখনও ভয় পেয়েছিলি।
–হ্যাঁ।
–তখনও পেরেছিলি।
এবারও পারবি।
গৌরী তার দিকে তাকিয়ে রইল।
–তুই সবসময় এত বিশ্বাস করিস কী করে?
–কারণ আমি হরনাথ পালের মেয়েকে চিনি।
কয়েকদিন পরে গ্রামের মানুষ, ছাত্রছাত্রী, কৃষক, জেলে, কামার, কুমোর–সবাই মিলে জমি পরিষ্কার করতে শুরু করল।
বৃদ্ধ হরিচরণ মাস্টারমশাই নিজ হাতে প্রথম কোদাল চালালেন।
রশিদ মিঞা মাটি মাথায় করে সরালেন।
সাকিলা মহিলাদের নিয়ে কাজ শুরু করল।
অরূপ শহর থেকে বই ও খাতা নিয়ে এল।
আর গৌরী–
দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।
এ কান্না দুঃখের নয়।
এ কান্না স্বপ্নের।
হঠাৎ আকাশে হালকা বৃষ্টি নামল।
হরিচরণবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন–

–দেখো, হরনাথ আর গঙ্গা আশীর্বাদ করছেন।
সেই দিন–
শিলপুকুরের পাড়ে,
দুই বিঘা জমির উপর,
এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে গৌরী উচ্চারণ করল–
–আজ থেকে শুরু হলো...
"হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"।
আর সেই মুহূর্তে–
এক কুমোরের স্বপ্ন,
এক মায়ের শেষ ইচ্ছা,
এক বন্ধুর ত্যাগ,
এক শিক্ষকের আশীর্বাদ,
আর এক গ্রামের ভালোবাসা–
এক হয়ে গেল।
কিন্তু নিয়তি এখনও নতুন পরীক্ষার আয়োজন করে রেখেছে।
কারণ–
স্বপ্নের ভিত্তি স্থাপন করা যত কঠিন,
তাকে রক্ষা করা তার থেকেও কঠিন।
– পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ষড়্বিংশ অধ্যায়
ঝড়, বন্যা ও মানুষের জয়
"প্রকৃতি কখনো কখনো মানুষকে ভেঙে দেয় না, বরং পরীক্ষা নেয়– মানুষ কতটা মানুষ হতে পেরেছে।"
ভাদ্র মাস।
আকাশে দিনের পর দিন কালো মেঘ।
অবিরাম বৃষ্টি।
শিলপুকুরের জল বাড়ছে।
নদী ফুলে উঠেছে।
কিন্তু কুমোরপাড়ার মানুষ ব্যস্ত "হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর কাজ নিয়ে।
বাঁশের কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে।
মাটির দেওয়াল তৈরি হচ্ছে।
অরূপ শহর থেকে বই, বেঞ্চ আর ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবস্থা করছে।
নিতাই দিনরাত শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছে।
গৌরী গ্রামের মেয়েদের নিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করছে।
হরিচরণ মাস্টারমশাই প্রতিদিন এসে কাজ দেখে যান।
রশিদ মিঞা হাসতে হাসতে বলেন–
–এই বুড়ো হাড়েও এখনও জোর আছে।
কিন্তু তিনদিন ধরে অবিরাম বর্ষণ।
এক সন্ধ্যায় হঠাৎ খবর এল–
নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে।
গ্রামের মানুষ আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করল।
–জল আসছে!
–বাঁচাও!
–সব শেষ!
মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে হাহাকার।

শিলপুকুর উপচে পড়ছে।
নির্মীয়মাণ বিদ্যালয়ের দিকে তীব্র স্রোত ধেয়ে আসছে।
গৌরীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
—না!
এত কষ্ট!
এত স্বপ্ন!
সব ভেসে যাবে?
নিতাই এক মুহূর্ত দেরি করল না।
—চলো!
অরূপ চিৎকার করে বলল—
—সবাই বাঁধের দিকে!
গ্রামের যুবকেরা ছুটে এল।
বস্তা ভর্তি বালি নিয়ে ছুটছে মানুষ।
মহিলারা মশাল জ্বালিয়ে আলো ধরেছে।
বৃদ্ধ হরিচরণবাবুও এসে দাঁড়ালেন।
—আমিও থাকব।
গৌরী কাঁদতে কাঁদতে বলল—
—মাস্টারমশাই, আপনি যাবেন না।
—হরনাথের স্বপ্ন রক্ষা করতে প্রাণ গেলেও দুঃখ নেই মা।
রাত বাড়ছে।
বৃষ্টি বাড়ছে।
জল কোমর ছুঁয়ে গেছে।
একটা প্রবল ঢেউ এসে বিদ্যালয়ের উত্তর দিকের বাঁশের কাঠামো ভেঙে ফেলল।
গৌরী চিৎকার করে উঠল—
—নিতাই!
কারণ নিতাই তখন সেই দিকেই কাজ করছিল।
মুহূর্তের মধ্যে স্রোতে ভেসে গেল একটা বড় বাঁশ।
নিতাই সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল।
হঠাৎ পা পিছলে সে নিজেই জলে পড়ে গেল।
—নিতাই!
গৌরীর বুকফাটা চিৎকার।
অরূপ এক মুহূর্ত চিন্তা করল না।
দড়ি বেঁধে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
গ্রামের সবাই স্তব্ধ।
প্রবল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অরূপ নিতাইয়ের হাত ধরল।
কিন্তু দুজনেই স্রোতে টলছে।
ঠিক তখন রশিদ মিঞা আর গ্রামের কয়েকজন যুবক দড়ি ধরে টান দিল।
অনেক কষ্টে দুজনকে তুলে আনা গেল।
গৌরী ছুটে এসে ভিজে মাটিতে বসে পড়ল।
—তোরা পাগল!
দুজনেই যদি চলে যেতি?
নিতাই হেসে বলল—
—স্কুলটা তো বাঁচাতে হতো।
অরূপও মৃদু হেসে বলল—

—আমাদের প্রাণের দাম তার থেকে বেশি নয়।
গৌরীর চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ল।
ভোর হলো।
বৃষ্টি থেমেছে।
সূর্যের আলো ফুটেছে।
ক্লান্ত মানুষগুলো চারদিকে তাকিয়ে দেখল—
বিদ্যালয়ের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
কিন্তু মূল কাঠামো অক্ষত।
বেঁচে গেছে।
হরিচরণবাবুর চোখ ভিজে উঠল।
—মানুষ হেরে যায়নি।
মানুষ জিতেছে।
রশিদ মিঞা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—
—আল্লাহ মহান।
গৌরী দুহাত জোড় করে ফিসফিস করে বলল—
—মা, বাবা...
তোমাদের স্বপ্ন বেঁচে আছে।
সেই দিন কুমোরপাড়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লেখা হলো।
হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ—
সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল।
অরূপের নেতৃত্ব,
নিতাইয়ের আত্মত্যাগ,
গ্রামের ঐক্য,
আর গৌরীর অদম্য বিশ্বাস—
সব মিলিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের জয় হলো।
কিন্তু সেই রাতের ঘটনা অরূপের হৃদয়ে এক নতুন উপলব্ধির জন্ম দিল।
সে বুঝল—
নিতাই শুধু গৌরীর ছায়াসঙ্গী নয়।
সে এক বিরল মানুষ।
আর ভালোবাসা মানে শুধু কাউকে পাওয়া নয়—
তার স্বপ্নকে নিজের স্বপ্ন করে নেওয়া।
কিন্তু ভাগ্য তখন আরও এক নতুন পরীক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছে।
কারণ—
শহর থেকে এক বড় সংবাদ আসতে চলেছে।
যে সংবাদ গৌরীর জীবনকে শুধু কুমোরপাড়ার নয়—
সমস্ত জেলার মানুষের কাছে পরিচিত করে তুলবে।
— ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

সপ্তবিংশ অধ্যায়
আলোর স্বীকৃতি
"প্রদীপ কখনো নিজের জন্য জ্বলে না। সে জ্বলে অন্যের অন্ধকার দূর করার জন্য। আর সেই আলোই একদিন পৃথিবীর চোখে ধরা পড়ে।"
আশ্বিন মাস।
বর্ষার বিদায়, শরতের আগমন।
নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। শিলপুকুরের ধারে কাশফুল দুলছে। কুমোরপাড়ার বাতাসে আজ এক অন্যরকম আনন্দ।

বন্যার ক্ষত ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে।

"হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর কাজ আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে।

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের মানুষ কাজ করছে।

কেউ বাঁশ কাটছে।

কেউ ইট বইছে।

কেউ আবার নিজের হাতে দেওয়াল লেপে দিচ্ছে।

হরিচরণ মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেন।

চোখে আনন্দের জল।

একদিন সকালে ডাকপিয়ন এসে একটি বড় খাম দিয়ে গেল।

জেলা প্রশাসনের চিঠি।

গৌরী খুলে পড়তেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমাজসেবা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাকে সম্মানিত করা হবে।
অরূপ আনন্দে বলে উঠল–
–এ তো আমাদের সবার সম্মান!
সাকিলা হাততালি দিয়ে উঠল–
–গৌরী, তুই সত্যিই পেরেছিস!
রশিদ মিঞা চোখ মুছতে মুছতে বললেন–
–হরনাথ ভাই, তোমার মেয়ে আজ গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে।
কিন্তু গৌরী শুধু বাবার মাটির চাকার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল–
–বাবা, এই সম্মান তোমার।
কয়েকদিন পর কলকাতার একটি সংবাদপত্রে বড় করে খবর বের হলো–
"এক কুমোরের কন্যার স্বপ্নে গড়ে উঠছে গরিব শিশুদের বিদ্যালয়"
সাংবাদিকরা এলেন।

ছবি তুললেন।

গৌরীর সাক্ষাৎকার নিলেন।
–আপনার সাফল্যের রহস্য কী?
গৌরী মৃদু হেসে বলল–
–আমি একা নই।
আমার বাবা-মায়ের স্বপ্ন, শিক্ষকের আশীর্বাদ, গ্রামের মানুষের ভালোবাসা আর দুই বন্ধুর ত্যাগ–
সব মিলিয়ে এই পথ তৈরি হয়েছে।
–দুই বন্ধু?
–হ্যাঁ।

একজন অরূপ।

আর একজন–

আমার ছায়াসঙ্গী নিতাই।

ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে নিতাই লজ্জায় মাথা নিচু করল।

সেই রাতেই অরূপ একা শিলপুকুরের ঘাটে বসে ছিল।

পূর্ণিমার আলো।

জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবি।

তার মনে আজ এক অদ্ভুত শান্তি।

সে বুঝেছে–

ভালোবাসা মানে অধিকার নয়।

ভালোবাসা মানে প্রিয় মানুষের সুখের জন্য নিজের ইচ্ছাকেও বিসর্জন দেওয়া।

নিতাই এসে পাশে বসলো।
–কী ভাবছেন?
অরুপ মৃদু হেসে বলল–
–ভাবছি, আমি খুব ভাগ্যবান।
–কেন?
–কারণ তোমার মতো একজন মানুষকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি।
নিতাই অবাক।
–আমি?
–হ্যাঁ।
তুমি আমাকে ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ শিখিয়েছ।
দুজনেই হেসে উঠল।
সেই হাসিতে কোনো হিংসা নেই।
শুধু গভীর মানবিকতা।
কিন্তু সুখের মাঝেও নতুন বিপদ এল।
হরিপদ চক্রবর্তীর শরীর খারাপ হতে শুরু করল।
নিতাই নিজের অসুস্থ বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।
ঋণের চাপও বেড়েছে।
জমি বন্ধক রাখা হয়েছে।
অনেকেই বলছে–
–নিজের সংসার সামলাতে পারছ না, আবার স্কুল!
কিন্তু নিতাই শুধু হাসে।
–স্বপ্নের ঋণ শোধ করতে টাকা লাগে না।
অবশেষে এল সেই দিন।
কার্তিক মাস।
"হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর উদ্বোধনের দিন।
সারা গ্রাম উৎসবের পোশাকে।
মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে।
মসজিদ থেকেও দোয়ার ধ্বনি ভেসে আসছে।
ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ছোট্ট বিদ্যালয়।
দরজার উপরে লেখা–
"হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"
নীচে–
"বিদ্যাই মুক্তি।"
ফিতা কাটার জন্য সবাই গৌরীকে ডাকল।
গৌরী মাথা নাড়ল।
–না।
এই বিদ্যালয়ের প্রথম দরজা খুলবেন হরিচরণ মাস্টারমশাই।
আর সঙ্গে থাকবেন রশিদ মিঞা।
কারণ আমার বাবার স্বপ্নে ধর্মের কোনো দেয়াল ছিল না।
সমস্ত গ্রাম করতালিতে ফেটে পড়ল।
কাঁপা হাতে হরিচরণবাবু ফিতা কাটলেন।
রশিদ মিঞা চোখ মুছলেন।
আর প্রথম ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খাতা বুকে চেপে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করল।
গৌরীর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।
তার মনে হলো–
আজ আকাশের ওপার থেকে হরনাথ পাল আর গঙ্গা দেবী হাসছেন।
কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে–
দূর থেকে একটি কালো গাড়ি এসে থামল।
নেমে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক।
সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি।
চোখে গোল চশমা।
তিনি বিদ্যালয়ের নামফলকের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।
তারপর ধীরে ধীরে বললেন–
–আমি অনেকদিন ধরে এই মানুষটিকে খুঁজছি...
হরনাথ পালের মেয়েটি কে?
সবাই বিস্ময়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাল।
গৌরী এগিয়ে এল।
–আমি।
বৃদ্ধের চোখ ভিজে উঠল।
–তাহলে সময় এসেছে...
একটি বহু বছরের গোপন সত্য প্রকাশ করার।
– সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
অতীতের দরজা

"মানুষের জীবনে কিছু সত্য সময়ের কাছে লুকিয়ে থাকে। সময় এলেই তারা ফিরে আসে– অশ্রু, বিস্ময় আর নতুন দায়িত্ব নিয়ে।"
কার্তিকের সেই শুভ সকাল।
"হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর উদ্বোধন শেষ হয়েছে।
ছোট ছোট শিশুরা নতুন বই হাতে হাসছে।
গ্রামের মানুষ আনন্দে আপ্লুত।
ঠিক সেই সময় কালো গাড়ি থেকে নামা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথায় সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।
–আমি অনেকদিন ধরে হরনাথ পালের মেয়েকে খুঁজছি।
গৌরী নম্রভাবে বলল–
–আমি গৌরী পাল।
বৃদ্ধের চোখ ছলছল করে উঠল।
–তাহলে আজ আমার অনেক বছরের ঋণ শোধ করার দিন।
হরিচরণ মাস্টারমশাই এগিয়ে এলেন।
–আপনি কে?
ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন–
–আমি অধ্যাপক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।
একসময় হরনাথ পালের বন্ধু।
কথাটা শুনে সবাই বিস্মিত।
গৌরী অবাক।
–বাবার বন্ধু?
–হ্যাঁ মা।

তোমার বাবা শুধু একজন কুমোর ছিলেন না।
তিনি ছিলেন আমার সহপাঠী।
আমার প্রাণের বন্ধু।
সবাই বিদ্যালয়ের ঘরে বসল।
শিবপ্রসাদবাবু ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন।
–পঞ্চাশ বছর আগে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।
হরনাথ ছিল অসাধারণ মেধাবী।
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগও পেয়েছিল।
কিন্তু...
–কিন্তু কী?
–তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন।
সংসার ভেঙে গেল।
তখন সে পড়াশোনা ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেল।
আমি অনেক অনুরোধ করেছিলাম।
কিন্তু সে বলেছিল–
"আমার সংসার আগে। যদি আমি পড়তে না পারি, একদিন আমার সন্তান পড়বে। আর সে শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্যও আলো জ্বালাবে।"
গৌরীর বুক কেঁপে উঠল।
চোখের জল আর ধরে রাখতে পারল না।
–বাবা...
শিবপ্রসাদবাবু ব্যাগ থেকে একটি পুরোনো ডায়েরি বের করলেন।
–এটা হরনাথের।
ওর মৃত্যুর পরে আমি খবর পাইনি।
অনেক বছর ধরে খুঁজেছি।
আজ তোমাদের খুঁজে পেলাম।
ডায়েরির প্রথম পাতায় লেখা–
"যদি কোনোদিন আমার মেয়ে বড় হয়, তাকে বলো, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম।"
গৌরীর চোখ ভিজে গেল।
নিতাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।
অরূপের বুকও ভারী হয়ে উঠল।
তারপর শিবপ্রসাদবাবু আরেকটি খাম বের করলেন।
–এটা শুধু স্মৃতি নয়।
এটা দায়িত্ব।
সবাই অবাক হয়ে তাকাল।
–কী আছে এতে?
–আমার আর হরনাথের যৌথ নামে কেনা পাঁচ বিঘা জমির দলিল।
হরনাথ তার অংশ কখনো নেয়নি।
আমি সন্তানহীন।
আজ সেই জমি আমি "হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর নামে দান করতে চাই।
ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এল।
হরিচরণ মাস্টারমশাই কাঁদতে লাগলেন।
–হরনাথ!

তুই আজও ফিরলি!
রশিদ মিঞা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন–
–আল্লাহর কী রহমত!
গৌরী কাঁপা গলায় বলল–
–আমি এই দান গ্রহণ করছি না নিজের জন্য।
এই গ্রামের সব শিশুদের জন্য।
শিবপ্রসাদবাবু হাসলেন।
–সেই জন্যই তো এসেছি মা।
সেই রাতে শিলপুকুরের ধারে বসে ছিল গৌরী, নিতাই ও অরূপ।
আকাশে লক্ষ তারা।
হালকা শীতের বাতাস।
গৌরী বলল–
–আজ মনে হচ্ছে বাবা আবার ফিরে এসেছেন।
নিতাই মৃদু হাসল।
–তিনি কখনো যাননি।
অরূপ বলল–
–মহান মানুষরা শরীর ছেড়ে যান, স্বপ্ন ছেড়ে যান না।
ঠিক তখনই শিবপ্রসাদবাবু এসে পাশে দাঁড়ালেন।
–একটা কথা বলব?
–বলুন।
–এই বিদ্যালয় শুধু প্রাথমিক স্কুল হয়ে থাকলে চলবে না।
একে বড় করতে হবে।
গ্রন্থাগার হবে।
অনাথ আশ্রম হবে।
মেয়েদের জন্য আবাসন হবে।
আর...
একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ও।
গৌরীর চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।
–বিশ্ববিদ্যালয়?
শিবপ্রসাদবাবু মৃদু হেসে বললেন–
–হরনাথের অসমাপ্ত স্বপ্ন শুধু একটি স্কুল নয় মা।
একটি আলোর সাম্রাজ্য।
দূরে শিলপুকুরের জলে চাঁদের আলো কাঁপছিল।
কিন্তু নিয়তি আবার এক নতুন অধ্যায়ের দ্বার খুলে দিল।
কারণ–
যেখানে আলো জন্মায়,
সেখানে অন্ধকারও তাকে গ্রাস করতে চায়।
আর কুমোরপাড়ার এই নতুন উত্থান–
কিছু মানুষের চোখে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।
এক নতুন শত্রু,
এক নতুন ষড়যন্ত্র,
আর এক কঠিন সংগ্রাম–
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।
– অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ঊনত্রিংশ অধ্যায়
ঈর্ষার আগুন
"আলো যখন জ্বলে, অন্ধকার তখন ভয় পায়। আর ভয় থেকেই জন্ম নেয় ঈর্ষা, মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র।"
অগ্রহায়ণ মাস।
"হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর খ্যাতি এখন আর শুধু কুমোরপাড়ায় সীমাবদ্ধ নেই।
আশেপাশের পাঁচ-ছয়টি গ্রামের গরিব ছেলে-মেয়েরা এখানে পড়তে আসছে।
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দান করা জমিতে নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে।
গ্রন্থাগারের জন্য বই আসছে।
শহরের কিছু শিক্ষিত মানুষও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।
জেলা প্রশাসন বিদ্যালয়টিকে বিশেষ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছে।
সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো এগিয়ে চলেছে।
কিন্তু–
সব মানুষের চোখে এই আনন্দ ছিল না।
কুমোরপাড়ার পাশের বাজারে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং পঞ্চায়েত সদস্য মহেন্দ্র সাঁতরা বহুদিন ধরে সেই জমির উপর নজর রেখেছিল।
সেখানে একটি গুদামঘর ও ব্যবসায়িক কমপ্লেক্স গড়ার পরিকল্পনা ছিল তার।
সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল–
–একটা কুমোরের মেয়ে এত বড় হবে?
আর গ্রামের লোকজনও পাগল হয়ে গেছে!
তার পাশে বসা গণেশ বাগ বলল–
–লোকজন এখন ওর কথাই শুনছে।
–তাহলে এমন কিছু করতে হবে যাতে সবাই ওর বিরুদ্ধে যায়।
মহেন্দ্রর চোখে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল।
কয়েকদিন পরে হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ল–
বিদ্যালয়ের নামে আসা টাকার হিসাব নাকি ঠিক নেই।
কেউ কেউ বলতে লাগল–
–এত টাকা আসে কোথা থেকে?
–শহরের লোকদের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো যোগসাজশ আছে।
–গৌরী নাম করে টাকা নিচ্ছে!
এই খবর শুনে গৌরীর বুক ভেঙে গেল।
–আবার?
আবার অপবাদ?
হরিচরণ মাস্টারমশাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।
–মিথ্যা একদিন ভেঙে পড়বেই।
কিন্তু গৌরীর চোখে সেই পুরোনো যন্ত্রণার ছায়া ফিরে এল।
এক সন্ধ্যায় পঞ্চায়েতে সভা বসল।
মহেন্দ্র সাঁতরা সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল–
–টাকার হিসাব দিতে হবে।
নইলে এই বিদ্যালয় বন্ধ করা হবে।
সারা সভাঘর গুঞ্জনে ভরে উঠল।
ঠিক তখনই অরূপ উঠে দাঁড়াল।
–হিসাব অবশ্যই হবে।
প্রতিটি টাকার হিসাব আছে।
আর সেই হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।

মহেন্দ্র ব্যঙ্গ করে বলল–
–তুমি শহরের ছেলে, তোমার এত মাথাব্যথা কেন?
অরুপ শান্তভাবে বলল–
–কারণ মানুষের স্বপ্নের কোনো ঠিকানা হয় না।
ঠিক তখনই নিতাই উঠে দাঁড়াল।
তার শান্ত মুখে সেদিন অদ্ভুত দৃঢ়তা।
–মহেন্দ্রবাবু, আমার জমি, আমার ঘাম, আমার বাবার শ্রম–সব এখানে আছে।
কাউকে এক পয়সা আত্মসাৎ করতে দেখলে আমিই প্রথম বিচার চাইব।
কিন্তু মিথ্যে অপবাদ সহ্য করব না।
মহেন্দ্র বিদ্রূপ করে বলল–
–তুই তো গৌরীর ছায়া!
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–হ্যাঁ।
মানুষের ভালো কাজে ছায়া হয়ে থাকতে লজ্জা নেই।
কিন্তু অন্যায়ের পাশে দাঁড়াতে লজ্জা আছে।
পুরো সভাঘর করতালিতে ফেটে পড়ল।
পরদিন অরুপ সমস্ত হিসাবের খাতা, দানের রসিদ, ব্যাংকের নথি সবার সামনে তুলে ধরল।
শিবপ্রসাদবাবুও এসে বললেন–
–আমার জীবনের সঞ্চয় আমি এই প্রতিষ্ঠানে দিয়েছি।
আমি কি এতদিন মানুষ চিনিনি?
মহেন্দ্র সাঁতরার মুখ শুকিয়ে গেল।
কিন্তু তার রাগ আরও বেড়ে উঠল।
সেই রাতেই বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের একাংশে আগুন লাগার চেষ্টা হলো।
ভাগ্যক্রমে রশিদ মিঞা ফজরের নামাজের আগে কিছু লোককে পালাতে দেখে চিৎকার করে ওঠেন।
গ্রামের মানুষ ছুটে এসে আগুন নেভাল।
ভোরের আলো ফুটতেই সবাই বুঝতে পারল–
এটা দুর্ঘটনা নয়।
ষড়যন্ত্র।
গৌরী পুড়ে যাওয়া বাঁশগুলোর দিকে তাকিয়ে নির্বাক।
তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।
–মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে?
রশিদ মিঞা বললেন–
–অন্ধকার আলোকে ভয় পায় মা।
তাই তাকে নিভিয়ে দিতে চায়।
ঠিক তখনই হরিচরণ মাস্টারমশাই কাঁপা গলায় বললেন–
–যেদিন বিদ্যাসাগরকে অপমান করা হয়েছিল, তিনি থেমে যাননি।
যেদিন রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করা হয়েছিল, তিনিও থেমে যাননি।
তুইও থামবি না।
গৌরী চোখের জল মুছে দাঁড়িয়ে গেল।
–না।
আমি থামব না।
এটা আমার বাবার স্বপ্ন।
এটা মায়ের শেষ আশীর্বাদ।

এটা নিতাইয়ের ত্যাগ।
এটা অরুপের সংগ্রাম।
এটা কুমোরপাড়ার মানুষের ভালোবাসা।
একটা আগুনে এই আলো নিভবে না।
দূরে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র সাঁতরা সব দেখছিল।
তার চোখে তখনও ঈর্ষার ছায়া।
কিন্তু সে জানত না–
নিয়তি তার জন্যও এক কঠিন বিচার লিখে রেখেছে।
কারণ–
মানুষের আদালতকে ফাঁকি দেওয়া যায়,
কিন্তু কর্মের বিচারকে নয়।
– ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ত্রিংশ অধ্যায়
কর্মফল
"ক্ষমা দুর্বলতার পরিচয় নয়, ক্ষমা সেই শক্তি– যা প্রতিশোধের আগুনকেও শান্তির প্রদীপে রুপান্তরিত করে।"
পৌষ মাস।
শীতের কুয়াশায় ঢেকে আছে কুমোরপাড়া।
"হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর পোড়া অংশ মেরামতের কাজ আবার শুরু হয়েছে। আগুনের ক্ষত এখনও মুছে যায়নি, কিন্তু মানুষের মনোবল আগের চেয়ে আরও দৃঢ়।
গৌরী প্রতিদিন শিশুদের পড়ায়।
অরুপ হিসাবপত্র, গ্রন্থাগার ও নতুন ভবনের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত।
নিতাই নিজের অসুস্থ বাবার সেবা, জমির কাজ আর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব–সব একসঙ্গে সামলাচ্ছে।
হরিচরণ মাস্টারমশাই প্রায়ই বলেন–
–যে গাছ ঝড়ে ভাঙে না, সে আরও গভীর শিকড় গাঁথে।
এদিকে মহেন্দ্র সাঁতরা ক্রমশ একা হয়ে পড়ছিল।
গ্রামের মানুষ তার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে।
তার ব্যবসাতেও লোকসান শুরু হয়েছে।
কিন্তু অহংকার এখনও তাকে ছাড়েনি।
একদিন গভীর রাতে বাজার থেকে ফেরার পথে তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে গেল।
চারদিকে ঘন কুয়াশা।
ড্রাইভার অজ্ঞান।
মহেন্দ্রর বুক ও মাথায় গুরুতর আঘাত।
কেউ খবর পেল না।
ভোরে বিদ্যালয়ের জন্য বাঁশ আনতে যাচ্ছিল নিতাই।
হঠাৎ রাস্তার পাশে ভাঙা গাড়ি দেখতে পেল।
দৌড়ে গিয়ে দেখে–
মহেন্দ্র সাঁতরা!
মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।
নিতাই এক মুহূর্ত দেরি করল না।
–বাঁচাও!
মানুষ ছুটে এল।
খবর পেয়ে অরুপও পৌঁছে গেল।

মহেন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।
খবর শুনে গৌরীও হাসপাতালে এল।
সবাই অবাক।
যে মানুষটি তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে,
যে বিদ্যালয়ে আগুন লাগাতে চেয়েছিল,
তার জন্যই আজ গৌরী ছুটে এসেছে!
মহেন্দ্রর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে গৌরীর পায়ে পড়ে বললেন–
–মা, ওকে বাঁচাও।
আমাদের ক্ষমা করো।
গৌরী তাকে তুলে ধরে বলল–
–মা, মানুষের বিপদে শত্রু বলে কিছু থাকে না।
ডাক্তার বললেন–
–রক্তের প্রয়োজন।
একই গ্রুপের রক্ত এখনই দরকার।
সবার মুখ ফ্যাকাশে।
ঠিক তখন নিতাই এগিয়ে এল।
–আমার রক্ত পরীক্ষা করুন।
কিছুক্ষণ পরে জানা গেল–
রক্ত মিলে গেছে।
নিতাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রক্ত দিল।
অরূপ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।
–যে মানুষ তোমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, তার জন্যও?
নিতাই মৃদু হাসল।
–রক্ত দেওয়ার সময় মানুষ শত্রু না বন্ধু–এসব ভাবা যায়?
মানুষ তো মানুষই।
অরূপের চোখ ভিজে উঠল।
–তুমি সত্যিই বড় মানুষ, নিতাইদা।
কয়েকদিন পরে মহেন্দ্রর জ্ঞান ফিরল।
প্রথমেই সে দেখল–
তার মাথার কাছে বসে আছে গৌরী।
আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিতাই।
সব শুনে মহেন্দ্র কেঁদে ফেলল।
–আমি পাপ করেছি।
তোমাদের শেষ করতে চেয়েছিলাম।
আর তোমরা আমাকে বাঁচালে?
গৌরী শান্ত গলায় বলল–
–অন্যায়কে ঘৃণা করতে হয়, মানুষকে নয়।
মহেন্দ্র কাঁপা হাতে নিতাইয়ের হাত ধরে বলল–
–আমাকে ক্ষমা করো।
নিতাই শুধু বলল–
–নতুন করে শুরু করুন।
এটাই যথেষ্ট।
হাসপাতাল থেকে ফিরে মহেন্দ্র সাঁতরা পুরো গ্রামের সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করল–
–বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আমিই করেছিলাম।

আগুন লাগানোর লোকও আমিই পাঠিয়েছিলাম।
আজ আমি অপরাধী।
আমাকে শাস্তি দিন।
গ্রাম নিস্তব্ধ।
গৌরী উঠে দাঁড়াল।
—আপনার শাস্তি একটাই।
এখন থেকে এই বিদ্যালয়ের একজন অভিভাবক হবেন।
আপনার শক্তি ধ্বংসে নয়, সৃষ্টিতে লাগাবেন।
মহেন্দ্র হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।
হরিচরণ মাস্টারমশাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—
—এই তো প্রকৃত শিক্ষা।
কয়েক মাসের মধ্যে এই ঘটনার খবর সংবাদপত্রে ছড়িয়ে পড়ল।
সবাই লিখল—
"যে নারী শত্রুকেও ক্ষমা করে মানুষ বানাতে পারে, তিনিই প্রকৃত কুমোরপাড়ার দুর্গা।"
জেলার মানুষ গৌরীকে নতুন নামে ডাকতে শুরু করল—
"লোকমাতা গৌরী"।
কিন্তু গৌরীর কাছে এসব নামের মূল্য ছিল না।
রাতে শিলপুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে সে শুধু বলল—
—বাবা, মা—
আমি কি ঠিক পথেই চলেছি?
হালকা শীতের বাতাস বয়ে গেল।
কাশফুল দুলে উঠল।
মনে হলো—
দূর আকাশ থেকে যেন আশীর্বাদের হাত নেমে এসেছে।
কিন্তু ভাগ্য এখনও শেষ অধ্যায় লেখেনি।
কারণ—
মানুষের জীবনে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন কখনো সমাজের নয়—
হৃদয়ের।
আর বহুদিন ধরে নীরবে জমে থাকা একটি প্রশ্ন—
গৌরী, নিতাই ও অরূপ—
এই তিনটি হৃদয়ের সামনে এসে দাঁড়াতে চলেছে।
— ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

একত্রিংশ অধ্যায়
হৃদয়ের বিচার

"মানুষের জীবনে সবচেয়ে কঠিন আদালত বাইরের নয়— নিজের হৃদয়ের ভিতরে। সেখানে কোনো বিচারক নেই, তবু সবচেয়ে কঠিন রায় সেখানেই লেখা হয়।"
মাঘ মাস।
শীতের শেষ প্রহর।
শিলপুকুরের জলে সকালের কুয়াশা ভেসে বেড়ায়। "হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর উঠোনে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাসির শব্দে মুখরিত চারদিক। নতুন ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপিত হয়েছে।
কিন্তু মানুষের বাহ্যিক সাফল্যের আড়ালে কখনো কখনো হৃদয়ের গভীরে অদৃশ্য ঝড় বয়ে যায়।
গৌরীর মনেও তেমন এক ঝড়।
কয়েকদিন ধরে সে লক্ষ্য করছে—

অরূপ যেন একটু দূরে দূরে সরে যাচ্ছে।

আগের মতো দীর্ঘ আলোচনা নেই।

হাসি নেই।

অকারণ গল্প নেই।

একদিন সন্ধ্যায় গৌরী বলল–

–অরূপ, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

অরূপ মৃদু হেসে বলল–

–না।

–তাহলে এত চুপচাপ কেন?

–কিছু কিছু কথা মানুষ নিজের কাছেই রেখে দেয়।

গৌরী উত্তর পেল না।

সেই রাতেই অরূপ শিলপুকুরের ঘাটে একা বসে ছিল।

পূর্ণিমার আলোয় জল চিকচিক করছে।

তার মনে ভেসে উঠছে অনেক স্মৃতি।

কলেজের প্রথম দিন।

গৌরীর সংগ্রাম।

অপমানের বিরুদ্ধে তার লড়াই।

স্বপ্নের জন্য তার চোখের জল।

আর নিতাই–

নিঃশব্দ, অকৃত্রিম, নিঃস্বার্থ এক মানুষ।

অরূপ নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করল–

"আমি কি গৌরীকে ভালোবাসি?"

উত্তর এল–

"হ্যাঁ।"

"তাহলে কেন তাকে পাওয়ার কথা ভাবছ না?"

অরূপ আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল–

"কারণ ভালোবাসা অধিকার নয়। ভালোবাসা মানে প্রিয় মানুষের শান্তি।"

তার চোখ ভিজে উঠল।

এদিকে নিতাইও অদ্ভুতভাবে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে।

বিদ্যালয়ের কাজ করে।

বাবার সেবা করে।

কিন্তু গৌরীর সামনে পড়লেই যেন সরে যায়।

একদিন গৌরী রাগ করে বলল–

–তুই কি আমায় এড়িয়ে চলছিস?

নিতাই হেসে বলল–

–পাগলি, এত কাজের মধ্যে সময় কোথায়?

–মিথ্যে বলিস না।

–সব সত্যি কথা বলা যায় না।

–কেন?

–কারণ কিছু কথা বললে সম্পর্ক বদলে যায়।

গৌরী চুপ করে গেল।

সেই রাতে গৌরী বাবার পুরোনো ডায়েরি খুলে বসেছিল।

হরনাথ পালের হাতের লেখা–

"জীবনে এমন মানুষ পেলে, যে তোমার স্বপ্নকে নিজের স্বপ্ন করে নেয়, তাকে কখনো হারাবি না।"

গৌরীর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল।
সে মনে মনে ভাবল–
অরূপ?
নাকি নিতাই?
দুজনেই তো তার স্বপ্নের পথের সাথি।
দুজনেই তার অন্ধকারে আলো হয়ে এসেছে।
তবে হৃদয়ের গভীরে কেন নিতাইয়ের মুখ দেখলে এক অদ্ভুত শান্তি নেমে আসে?
কেন তার চোখের জল দেখলে বুকটা কেঁপে ওঠে?
আর অরূপকে দেখলে কেন শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্বের গভীরতা অনুভব হয়?
নিজের কাছেই উত্তর খুঁজে পেল না সে।
একদিন হরিচরণ মাস্টারমশাই সব বুঝে ফেললেন।
তিনি অরূপ ও নিতাইকে নিয়ে শিলপুকুরের ধারে বটগাছের নিচে বসালেন।
–তোরা দুজনেই আমার ছাত্রের মতো।
একটা কথা বলব?
দুজনেই মাথা নাড়ল।
–ভালোবাসা মানুষকে ছোট করে না।
কিন্তু অহংকার ভালোবাসাকে ছোট করে।
যার মধ্যে ত্যাগ আছে, তার মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতা।
অরূপ শান্তভাবে বলল–
–মাস্টারমশাই, আমি চাই গৌরী সুখে থাকুক।
নিতাই মাথা নিচু করে বলল–
–আমিও।
–আর যদি ওর সুখ তোদের একজনের সঙ্গে হয়?
দুজনেই চুপ।
শুধু শীতের হাওয়ায় শুকনো পাতা ঝরে পড়ল।
কয়েকদিন পর কলকাতা থেকে একটি বড় প্রস্তাব এল।
গৌরীকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।
বিদেশ যাওয়ার সুযোগ।
সবাই আনন্দে আত্মহারা।
কিন্তু গৌরীর চোখে আনন্দের সঙ্গে এক অজানা বিষণ্ণতা।
কারণ–
বিদেশ যাওয়ার আগে তাকে নিজের হৃদয়ের কাছে সত্য স্বীকার করতেই হবে।
আর ঠিক তখনই–
অরূপ একটি চিঠি লিখতে শুরু করল।
চিঠির প্রথম লাইন–
"প্রিয় গৌরী, মানুষ জীবনে সবকিছু পায় না। কিন্তু কিছু ভালোবাসা আছে, যারা পাওয়ার জন্য নয়– আশীর্বাদ হয়ে থাকার জন্য জন্মায়..."
আর দূরে–
নিতাই নিঃশব্দে সিদ্ধান্ত নিল–
গৌরীর জীবনের পথে সে আর কোনোদিন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।
কিন্তু নিয়তি?
নিয়তি কি সত্যিই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে?
না–
ভালোবাসার শেষ বিচার এখনও বাকি।
– একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়
ত্যাগের আলোকশিখা
"যে প্রেম নিজেকে বিসর্জন দিতে জানে, সে কখনো পরাজিত হয় না। সে মানুষকে পেতে নয়, মানুষকে পূর্ণ করতে জন্মায়।"
ফাল্গুন মাস।
শীত বিদায় নিচ্ছে।
কুমোরপাড়ার মাঠে মাঠে সরষে ফুলের হলুদ হাসি। আম্রকুঞ্জে মুকুলের গন্ধ। "হরনাথ পাল স্মৃতি বিদ্যালয়"-এর উঠোনে বসন্ত উৎসবের প্রস্তুতি চলছে।
কিন্তু তিনটি হৃদয়ের মধ্যে তখন এক অদৃশ্য অস্থিরতা।
এক সন্ধ্যায় গৌরীর হাতে এসে পৌঁছল একটি চিঠি।
অরূপের লেখা।
কাঁপা হাতে চিঠি খুলল সে।
*"প্রিয় গৌরী,
জীবনে কিছু মানুষ আশীর্বাদের মতো আসে।
তারা পথ দেখায়, হাত ধরে, চোখের জল মুছে দেয়।
কিন্তু সব আশীর্বাদ সংসারের সম্পর্ক হয়ে ওঠে না।
তোমার পাশে থেকে আমি ভালোবাসার এক নতুন অর্থ শিখেছি।
তোমাকে আমি ভালোবাসি।
কিন্তু তার থেকেও বেশি শ্রদ্ধা করি।
তোমার চোখে যখন নিতাইয়ের জন্য উদ্বেগ দেখি, তখন বুঝতে পারি– মানুষের হৃদয়কে জোর করে পাওয়া যায় না।
আমি তোমাদের সুখের পথে কোনোদিন দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে চাই না।
আমার ভালোবাসা তোমাদের জন্য প্রার্থনা হয়ে থাকবে।
তোমার বন্ধু,
অরূপ।"*
চিঠির উপর গৌরীর অশ্রুবিন্দু পড়ল।
–অরূপ!
ঠিক সেই দিনই আরেকটি খবর এল।
নিতাই কোথাও নেই।
ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।
কাউকে কিছু বলেনি।
শুধু বাবার কাছে একটি চিঠি রেখে গেছে।
হরিপদ চক্রবর্তী কাঁদতে কাঁদতে গৌরীর হাতে চিঠিটা দিলেন।
*"গৌরী,
তোকে কখনো কিছু চাইনি।
আজও চাই না।
তুই অনেক বড় হবি।
তোর জীবনে আমি যেন কোনো বন্ধন না হয়ে যাই।
তাই একটু দূরে যাচ্ছি।
যেখানেই থাকি, তোর স্বপ্নের জন্য প্রার্থনা করব।
ভালো থাকিস।
–তোর নিতাই"*
গৌরীর মাথায় যেন বাজ পড়ল।
–নিতাই চলে গেছে?
কোথায়?

কেন?
তার বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেল।
সেই রাতে শিলপুকুরের ধারে একা বসে গৌরী কাঁদছিল।
পূর্ণিমার আলো জলে কাঁপছে।
বাবার ডায়েরি খুলে তার চোখ পড়ল একটি লাইনে—
"যে মানুষটি তোর চোখের জল দেখে নিজে কাঁদে, আর তোর হাসি দেখার জন্য নিজের সুখ ত্যাগ করে, সেই মানুষটিকে চিনতে ভুল করিস না।"
গৌরী আর স্থির থাকতে পারল না।
তার বুকের ভিতর থেকে একটি নামই উঠে এল—
—নিতাই!
সে বুঝতে পারল—
অরূপ তার জীবনের শ্রদ্ধা, বন্ধু, সহযোদ্ধা।
কিন্তু নিতাই—
তার শ্বাস, তার মাটি, তার শিকড়।
পরদিন ভোরে অরূপ নিজেই বলল—
—চলো।
—কোথায়?
—নিতাইকে খুঁজতে।
গৌরী বিস্ময়ে তাকাল।
—তুমি?
অরূপ মৃদু হেসে বলল—
—বন্ধুর জন্য এতটুকু করতে পারব না?
হরিচরণ মাস্টারমশাই, রশিদ মিঞা, সাকিলা—সবাই খোঁজ শুরু করলেন।
অবশেষে খবর পাওয়া গেল—
নিতাই নদীর ওপারের একটি আশ্রমে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করছে।
গৌরী আর অরূপ ছুটে গেল।
সন্ধ্যা।
আশ্রমের উঠোনে কয়েকজন অনাথ শিশুকে নিয়ে বসে গল্প করছে নিতাই।
হঠাৎ পিছন থেকে কাঁপা গলা—
—নিতাই!
চমকে উঠল সে।
গৌরী।
চোখ ভরা জল।
—তুই কেন চলে গেলি?
—তোর ভালো হবে বলে।
—আমার ভালো?
আমাকে না বলে?
আমাকে কাঁদিয়ে?
নিতাই মাথা নিচু করল।
—আমি তোকে বাঁধতে চাইনি।
গৌরী তার দুই হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—
—পাগল!
আমার শিকড়কে ছাড়া গাছ বাঁচে?
আমার বাবার স্বপ্নের পথের প্রথম সাথি কে?
আমার কান্না কে লুকিয়ে নিজের চোখে নিয়েছে?

তুই ছাড়া আমি কে?
নিতাই স্তব্ধ।
তার চোখও ভিজে উঠল।
দূরে দাঁড়িয়ে অরূপ সব দেখছিল।
তার মুখে গভীর শান্তির হাসি।
হরিচরণ মাস্টারমশাই ধীরে এসে তার কাঁধে হাত রাখলেন।
–কষ্ট হচ্ছে?
অরূপ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল–
–না।
আজ মনে হচ্ছে ভালোবাসা হেরে যায়নি।
আজ ভালোবাসা পূর্ণ হয়েছে।
বসন্তের বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে উঠল।
দূরে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি।
মসজিদ থেকে আজানের সুর।
আর সেই মুহূর্তে–
তিনটি হৃদয়,
তিনটি আত্মা,
প্রেম, বন্ধুত্ব আর ত্যাগের এক অমর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল।
কিন্তু–
জীবনের শেষ কথা এখনও লেখা হয়নি।
কারণ,
সময় নিয়ে আসছে আরও এক নতুন অধ্যায়–
যেখানে শুধু দুটি হৃদয়ের মিলন নয়,
মানুষের জন্য গড়ে ওঠা এক নতুন যুগের সূচনা অপেক্ষা করছে।
– দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়
নবযুগের সূর্যোদয়
"মানুষের জীবনে কিছু মিলন শুধু দুটি হৃদয়ের নয়, দুটি আদর্শেরও হয়। আর সেই মিলন থেকেই জন্ম নেয় নতুন যুগ।"
চৈত্র মাস।
বসন্তের শেষ দিনগুলো।
কুমোরপাড়ার আকাশে কৃষ্ণচূড়ার আগুনরাঙা রূপ। শিলপুকুরের ধারে পলাশ ফুটেছে। প্রকৃতি যেন নতুন করে সেজেছে।
আর মানুষের মনেও আজ উৎসব।
কারণ বহুদিনের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে।
নিতাই ফিরে আসার পর যেন কুমোরপাড়ায় আবার প্রাণ ফিরে এসেছে।
হরিপদ চক্রবর্তীর মুখে হাসি।
হরিচরণ মাস্টারমশাই প্রায়ই বলেন–
–হরনাথ, আজ তোর মেয়ে সত্যিই সুখ খুঁজে পেয়েছে।
গৌরীর চোখেও আজ অন্যরকম আলো।
এক সন্ধ্যায় বাবার মাটির চাকার সামনে দাঁড়িয়ে সে ধীরে বলল–
–বাবা, আমি নিতাইকে ছাড়া কোনোদিন বাঁচতে পারতাম না।
মনে হলো–
মৃদু বাতাসে কেউ যেন আশীর্বাদ করল।
বৈশাখের প্রথম দিন।

সারা কুমোরপাড়া উৎসবের রঙে সেজে উঠল।
কোনো আড়ম্বর নেই।
কোনো অহংকার নেই।
শুধু মানুষের ভালোবাসা।
মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি আর মসজিদের দোয়া মিলেমিশে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।
সেই দিন–
শিলপুকুরের পাড়ে,
হরনাথ পালের লাগানো বটগাছের ছায়ায়,
গ্রামের মানুষ, ছাত্রছাত্রী, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে–
গৌরী আর নিতাই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলো।
সিঁদুর পরানোর সময় গৌরীর চোখে জল।
নিতাই ফিসফিস করে বলল–
–কাঁদছিস কেন?
–আজ মা-বাবার কথা খুব মনে পড়ছে।
নিতাই মৃদু স্বরে বলল–
–ওঁরা আছেন।
আজও আশীর্বাদ করছেন।
অরূপ একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।
তার মুখে প্রশান্তির হাসি।
গৌরী এগিয়ে এসে বলল–
–তুমি দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?
অরূপ হেসে বলল–
–বন্ধুর জায়গা তো হৃদয়ের কাছেই থাকে।
নিতাই এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।
–তুই শুধু বন্ধু না।
আমার ভাই।
অরূপের চোখ ভিজে উঠল।
–আর তোরা আমার পরিবার।
কয়েক মাস পরে–
"হরনাথ পাল স্মৃতি ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠিত হলো।
সভাপতি হরিচরণ মাস্টারমশাই।
সম্পাদক অরূপ সেন।
কোষাধ্যক্ষ নিতাই চক্রবর্তী।
আর প্রধান ট্রাস্টি–
গৌরী পাল চক্রবর্তী।
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজের সমস্ত সম্পত্তির একটি বড় অংশ ট্রাস্টের নামে দান করলেন।
এক এক করে গড়ে উঠল–
� হরনাথ পাল স্মৃতি গ্রন্থাগার।
� গঙ্গা দেবী অনাথ আশ্রম।
� সাকিলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
� রশিদ মিঞা কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।
আর এই সবকিছুর মূলমন্ত্র–
"মানুষের জন্য মানুষ।"

একদিন সন্ধ্যায় শিলপুকুরের ধারে বসেছিল গৌরী, নিতাই ও অরূপ।
সূর্য অস্ত যাচ্ছে।
আকাশ রক্তিম।
গৌরী হেসে বলল–
–আমাদের পথটা কত কঠিন ছিল, না?
অরূপ হেসে বলল–
–তাই তো এত সুন্দর।
নিতাই মাটির দিকে তাকিয়ে বলল–
–সবই হরনাথ কাকার আশীর্বাদ।
ঠিক তখন কয়েকজন অনাথ শিশু দৌড়ে এসে গৌরীর আঁচল জড়িয়ে ধরল।
–মা!
গৌরী বিস্ময়ে তাকাল।
তারপর চোখ ভিজে উঠল।
মনে হলো–
আজ সে শুধু হরনাথ পালের মেয়ে নয়।
শুধু নিতাইয়ের স্ত্রী নয়।
সে শত শত শিশুর মা।
মানুষের মা।
লোকমাতা।
দূরে দাঁড়িয়ে হরিচরণ মাস্টারমশাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন–
–হরনাথ, গঙ্গা–
দেখো,
তোমাদের স্বপ্নের সূর্য উঠেছে।
আর সেই সূর্যের আলো
কুমোরপাড়া ছাড়িয়ে
একদিন বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।
শিলপুকুরের জলে তখন অস্তগামী সূর্যের প্রতিচ্ছবি কাঁপছিল।
কিন্তু সেই অস্ত যাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিল–
এক নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতি।
কারণ–
মানুষ মরে যায়,
স্বপ্ন মরে না।
ভালোবাসা ফুরিয়ে যায় না।
ত্যাগ হারিয়ে যায় না।
আর সত্যিকারের আলো–
যুগ থেকে যুগান্তরে পথ দেখিয়ে যায়।
– ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

চতুঃত্রিংশ অধ্যায়
লোকমাতার পথচলা
"একটি প্রদীপ যদি নিজের ঘর ছাড়িয়ে পথের মানুষের অন্ধকার দূর করে, তবেই সে সত্যিকারের আলো।"
জ্যৈষ্ঠ মাস।
"হরনাথ পাল স্মৃতি ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠার পর কেটে গেছে পাঁচটি বছর।
আজ কুমোরপাড়া আর সেই পুরোনো কুমোরপাড়া নয়।
যেখানে একদিন দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর হতাশা বাসা বেঁধেছিল–

সেখানে আজ সকালে বিদ্যালয়ের ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়।
গ্রন্থাগারে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়।
অনাথ আশ্রমে শিশুদের হাসি।
মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রামের মেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখছে।
আর এই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু–
লোকমাতা গৌরী।
নিতাই আর গৌরীর সংসারেও নতুন আলো এসেছে।
তাদের এক পুত্রসন্তান।
নাম–
হরিদীপ।
হরনাথের স্মৃতি আর আলোর প্রতীক।
ছোট্ট হরিদীপকে নিয়ে গৌরী যখন বিদ্যালয়ের উঠোনে যায়, তখন শিশুরা তাকে ঘিরে ধরে।
হরিদীপ সবার সঙ্গে মাটিতে বসে খেলে।
নিতাই হাসতে হাসতে বলে–
–একে দেখে মনে হয়, ও যেন গোটা গ্রামের ছেলে।
গৌরী মৃদু হেসে বলে–
–মানুষের সন্তান মানুষেরই হয়।
অরূপ এখন ট্রাস্টের প্রাণপুরুষ।
কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার পাশাপাশি সমাজসেবার কাজে যুক্ত।
কিন্তু এখনও প্রতি মাসে কয়েকদিন কুমোরপাড়ায় এসে থাকেন।
হরিদীপ তাকে "অরূপ কাকা" বলে ডাকে।
একদিন হরিদীপ জিজ্ঞাসা করল–
–কাকা, তুমি বিয়ে করোনি কেন?
অরূপ হেসে বলল–
–আমার অনেক ছেলে-মেয়ে আছে।
এই বিদ্যালয়ের সবাই আমার সন্তান।
নিতাই আর গৌরী চুপ করে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল।
তাদের চোখে অরূপের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে "হরনাথ পাল স্মৃতি ট্রাস্ট"-এর নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল।
জলপাইগুড়ি থেকে সুন্দরবন–
পুরুলিয়া থেকে কোচবিহার–
বিভিন্ন জেলায় নতুন বিদ্যালয়, পাঠাগার ও আশ্রম গড়ে উঠতে শুরু করল।
সংবাদপত্র লিখল–
"এক কুমোরের স্বপ্ন আজ বাংলার সম্পদ।"
মানুষ গৌরীকে নতুন নামে ডাকতে শুরু করল–
"বাংলার লোকমাতা"।
একদিন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গৌরীকে বিশেষ সম্মান দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ এল।
কলকাতার বিশাল সভাগৃহ।
মন্ত্রী, বিচারপতি, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক–সবাই উপস্থিত।
সম্মান গ্রহণ করতে উঠে গৌরী কিছুক্ষণ নীরব রইল।
তারপর বলল–
–আমি কোনো বিশেষ মানুষ নই।
আমি এক কুমোরের মেয়ে।

একজন মায়ের সন্তান।
একজন শিক্ষকের ছাত্রী।
একজন বন্ধুর ঋণী।
একজন স্বামীর ভালোবাসায় ধন্য।
যদি কিছু করে থাকি, তা মানুষের ভালোবাসায়।
আজকের এই সম্মান আমি উৎসর্গ করছি—
আমার বাবা হরনাথ পাল,
মা গঙ্গা দেবী,
হরিচরণ মাস্টারমশাই,
রশিদ মিঞা,
আর আমার দুই জীবনসাথী—
বন্ধু অরূপ এবং আমার নিতাইকে।
সারা সভাঘর দাঁড়িয়ে করতালিতে মুখর হয়ে উঠল।
সেই রাতে কুমোরপাড়ায় ফিরে শিলপুকুরের ধারে বসেছিল গৌরী।
পূর্ণিমার আলো।
হালকা বাতাস।
দূরে বাঁশবনের শব্দ।
গৌরী ধীরে বলল—
—নিতাই, আমি এত ভালোবাসা পেলাম কী করে?
নিতাই মৃদু হেসে বলল—
—ভালোবাসা চেয়ে পাওয়া যায় না।
ভালোবাসা মানুষকে দিয়ে যেতে হয়।
ঠিক তখন অরূপ এসে পাশে বসল।
হাসতে হাসতে বলল—
—তোদের সঙ্গে বুড়ো হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।
গৌরী হেসে উঠল।
—তুমি বুড়ো হবে?
তুমি তো এখনও ছাত্রদের প্রিয় অরূপদা।
তিনজনের হাসি ভেসে গেল রাতের নীরবতায়।
দূরে বটগাছের ছায়া।
হরনাথ পালের পুরোনো মাটির চাকা।
চাঁদের আলোয় যেন আজও ঘুরছে।
মনে হলো—
কোথাও থেকে গঙ্গা দেবীর কন্ঠ ভেসে আসছে—
"মানুষের জন্য বাঁচিস মা..."
আর আকাশের ওপার থেকে হরনাথ পাল যেন বলছেন—
"আলো জ্বালিয়ে যা..."
কিন্তু সময়ের চাকা থেমে থাকে না।
নতুন প্রজন্ম বড় হচ্ছে।
হরিদীপ বড় হচ্ছে।
আর নিয়তি ধীরে ধীরে প্রস্তুত করছে—
আর এক অধ্যায়।
যেখানে উত্তরাধিকার পাবে নতুন হাত।
আর লোকমাতার স্বপ্ন প্রবেশ করবে এক নতুন যুগে।

– চতুঃত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়
উত্তরাধিকার
"প্রদীপের আলো কখনো নিভে যায় না, এক হাত থেকে আরেক হাতে চলে যায়। মানুষ চলে যায়, কিন্তু আদর্শ বেঁচে থাকে উত্তরাধিকারের মধ্যে।"

আষাঢ় মাস।

লোকমাতা গৌরীর কর্মযজ্ঞ আজ সারা বাংলায় পরিচিত।

"হরনাথ পাল স্মৃতি ট্রাস্ট"-এর অধীনে দশটি বিদ্যালয়, পাঁচটি গ্রন্থাগার, তিনটি অনাথ আশ্রম ও বহু স্বনির্ভর প্রকল্প চলছে।

কিন্তু কুমোরপাড়ার সেই পুরোনো বটগাছের ছায়ায় জীবন এখনও আগের মতোই শান্ত।

সময় এগিয়ে গেছে।

ছোট্ট হরিদীপ এখন ষোলো বছরের কিশোর।

তার চোখে হরনাথ পালের স্বপ্নের দীপ্তি, আর মুখে গঙ্গা দেবীর কোমলতা।

একদিন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে হরিদীপকে দেখে হরিচরণ মাস্টারমশাই মৃদু হেসে বললেন–
–কী পড়ছিস দাদুভাই?
–বিদ্যাসাগর।
–কেন?
–মানুষ হতে চাই।

মাস্টারমশাইয়ের চোখ জলে ভরে উঠল।

–মানুষ হওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন শিক্ষা।

হরিদীপ প্রায়ই নিতাইয়ের সঙ্গে মাঠে যায়।

চাষের কাজ শেখে।

আবার সন্ধ্যায় গৌরীর সঙ্গে অনাথ আশ্রমে শিশুদের পড়ায়।

একদিন সে মাকে জিজ্ঞাসা করল–
–মা, তুমি এত মানুষের জন্য করো কেন?
গৌরী মৃদু হেসে বলল–
–কারণ একদিন অনেক মানুষ আমাদের জন্য করেছে।

মানুষের ঋণ মানুষের কাছেই শোধ করতে হয়।

এদিকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন হরিচরণ মাস্টারমশাই।

চোখে আগের মতো দেখতে পান না।

হাঁটতেও কষ্ট হয়।

তবু প্রতিদিন সকালবেলা বিদ্যালয়ের উঠোনে এসে বসেন।

শিশুদের হাসি শুনে শান্তি পান।

একদিন তিনি গৌরীকে ডেকে বললেন–
–মা।
–বলুন মাস্টারমশাই।
–আমার সময় ফুরিয়ে আসছে।

গৌরী আঁতকে উঠল।

–এ কথা বলবেন না।
–না মা।

জন্ম যেমন সত্যি, বিদায়ও তেমন সত্যি।

শুধু একটা দুঃখ–
হরনাথ আর গঙ্গার কাছে যেতে হবে।

তোদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।

–আপনি আমাদের বাবা।

সেই সন্ধ্যায় অরূপ কলকাতা থেকে এল।

এখন তার চুলে পাক ধরেছে।

কিন্তু চোখে সেই একই স্নেহ।

মাস্টারমশাই তাকে কাছে ডাকলেন।

–অরূপ।

–জি।

–তুই সংসার করলি না কেন?
অরূপ হেসে বলল–

–আমার সংসার তো এই কুমোরপাড়া।

এই ছেলেমেয়েরা।

এই স্বপ্ন।

মাস্টারমশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–

–তুই বড় কঠিন মানুষ রে।
অরূপ শান্ত কণ্ঠে বলল–

–না।

ভালোবাসা মানুষকে ছোট করেনি।

আর কিছু চাওয়ারও নেই।

কয়েকদিন পরে গুরুপূর্ণিমার দিন।

সারা বিদ্যালয়ে উৎসব।

শিশুরা গান গাইছে।

হরিদীপ আবৃত্তি করছে–
"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে..."
হরিচরণ মাস্টারমশাই চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন।
হঠাৎ বললেন–
–হরনাথ...
গঙ্গা...
আমি আসছি...
সবাই ছুটে এল।
গৌরী কাঁদতে কাঁদতে তার হাত ধরে বলল–
–মাস্টারমশাই!
তিনি মৃদু হাসলেন।

–কাঁদিস না মা।

তোরা মানুষ হয়েছিস।

আমার কাজ শেষ।

হরিদীপকে কাছে ডাকলেন।
–দাদুভাই...
মানুষ হবি।

বড় মানুষ নয়।

ভালো মানুষ।

এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

ধীরে ধীরে মাথা কাত হয়ে এল।
মুখে প্রশান্তির হাসি।
আর এক মহান শিক্ষক অনন্ত যাত্রায় পা রাখলেন।
সেই দিন কুমোরপাড়া আবার কাঁদল।
যেমন কেঁদেছিল হরনাথের জন্য।
যেমন কেঁদেছিল গঙ্গা দেবীর জন্য।
হরিদীপ অঝোরে কাঁদছিল।
অরূপ অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।
তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল–
–গুরুদেব, আপনার ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না।
কয়েকদিন পরে ট্রাস্টের সভায় অরূপ দাঁড়াল।
–আজ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
সবাই তাকিয়ে রইল।
–আমি কলকাতার চাকরি ছেড়ে স্থায়ীভাবে কুমোরপাড়ায় চলে আসব।
গৌরী বিস্ময়ে তাকাল।
–তুমি?
নিতাই এগিয়ে এসে তার হাত ধরল।
–এতদিন পরে?
অরূপ মৃদু হেসে বলল–
–বাড়ি ফিরতে দেরি হলেও, পথ তো ভুলিনি।
হরিদীপ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল–
–অরূপ কাকা, তুমি আর যাবে না তো?
অরূপ চোখের জল লুকিয়ে বলল–
–না রে।
এবার থেকে আমি তোদের সঙ্গেই।
সেই রাতে শিলপুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল চারজন–
গৌরী, নিতাই, অরূপ আর হরিদীপ।
আকাশভরা তারা।
বটগাছের ছায়া।
দূরে মাটির চাকা।
হরিদীপ বলল–
–বাবা, একদিন আমি কী হব?
নিতাই মৃদু হেসে বলল–
–যা খুশি হবি।
শুধু মানুষ হবি।
গৌরীর চোখ ভিজে উঠল।
আর অরূপ আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল–
"হরনাথ কাকা, গঙ্গা মা, গুরুদেব– প্রদীপ নিভে যায়নি। নতুন হাতে আলো পৌঁছে গেছে।"
– পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

ষটত্রিংশ অধ্যায়
শেষ প্রহরের আলো
"সূর্য যখন অস্ত যায়, তখনও তার আলো আকাশে থেকে যায়। মানুষও তেমনি– দেহের বিদায় ঘটে, কিন্তু ভালোবাসা ও আদর্শ যুগের পর যুগ বেঁচে থাকে।"

শারদীয়া পূর্ণিমা।
সময় বয়ে গেছে আরও ত্রিশটি বছর।
কুমোরপাড়া আজ আর শুধু একটি গ্রাম নয়।
এখন তার নাম—
"লোকমাতা গৌরী শিক্ষানগর"।
বাংলার নানা প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসে।
"হরনাথ পাল বিশ্ববিদ্যালয়", "গঙ্গা দেবী চিকিৎসাকেন্দ্র", "অরূপ সেন গবেষণা গ্রন্থাগার", "হরিচরণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ভবন"—
একটি স্বপ্ন আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।
লোকমাতা গৌরীর চুল সাদা হয়ে গেছে।
নিতাইয়ের কাঁধ নুয়ে এসেছে।
তবু ভোর হলে দুজনে এখনও শিলপুকুরের ধারে হাঁটতে যান।
বটগাছটি আরও বিশাল হয়েছে।
হরনাথ পালের মাটির চাকা এখন কাঁচের ঘরে সংরক্ষিত।
গৌরী মাঝে মাঝে তার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলেন—
—বাবা, দেখো, তোমার স্বপ্ন কত দূর এসেছে।
নিতাই মৃদু হেসে বলেন—
—কাকাবাবু এখনও সব দেখছেন।
হরিদীপ এখন চিকিৎসক।
বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করে ফিরে এসেছে।
কিন্তু শহরে বড় হাসপাতাল না করে—
সে প্রতিষ্ঠা করেছে—
"গঙ্গা দেবী সেবাসদন"।
তার স্ত্রী মেঘমালা একজন শিক্ষিকা।
তাদের কন্যা—
ছোট্ট "দীপশিখা"।
সে ঠিক তার প্রপিতামহ হরনাথের মতো মাটির খেলনা বানাতে ভালোবাসে।
অরূপ সেন এখন আশি ছুঁইছুঁই।
চোখে মোটা চশমা।
হাঁটেন লাঠি নিয়ে।
কিন্তু প্রতিদিন বিকেলে তিনি এখনও গ্রন্থাগারে গিয়ে বসেন।
ছাত্রছাত্রীরা তাকে ঘিরে গল্প শোনে।
সবাই তাকে ডাকে—
"অরূপ দাদু"।
একদিন দীপশিখা জিজ্ঞেস করল—
—দাদু, তুমি বিয়ে করোনি কেন?
অরূপ হেসে বললেন—
—আমার অনেক ভালোবাসা ছিল মা।
তাই আলাদা করে কাউকে আর কষ্ট দিতে চাইনি।
ছোট্ট মেয়েটি কিছু বুঝল না।
শুধু তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।
অরূপের চোখ ভিজে উঠল।
একদিন সন্ধ্যায় শিলপুকুরের ধারে বসে ছিলেন গৌরী, নিতাই আর অরূপ।
সূর্য ডুবছে।

আকাশ রক্তিম।
অরুপ মৃদু স্বরে বললেন–
–জানিস গৌরী?
জীবনে একটা আক্ষেপও নেই।
গৌরী হেসে বললেন–
–আমাদেরও নেই।
নিতাই বললেন–
–বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করা যায় না।
অরুপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–
–যেদিন প্রথম তোকে দেখেছিলাম, বুঝিনি–
তুই শুধু একজন মানুষ নয়।
একটা যুগ হয়ে উঠবি।
তিনজনেই হেসে উঠলেন।
কিন্তু সময় তার নিয়ম মানে।
শীতের এক রাতে অরুপ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।
শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি গৌরীর হাত ধরে বললেন–
–বন্ধু...
কাঁদিস না।
আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।
এই গ্রন্থাগারের বইয়ে,
এই ছেলেমেয়েদের চোখে,
তোদের হাসিতে–
আমি থাকব।
নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন–
–ভাই...
তোকে পেয়ে আমি ধন্য।
নিতাই অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন–
–আমাকেও ফেলে যাস না।
অরুপ মৃদু হাসলেন।
–মানুষ কি কাউকে ফেলে যায়?
ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই–
অরুপ সেন নিঃশব্দে চলে গেলেন।
মুখে শান্তি।
চোখে অপার তৃপ্তি।
সারা শিক্ষানগর কেঁদে উঠল।
হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী,
অসংখ্য অনাথ শিশু,
শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক–
সবাই যেন নিজের একজনকে হারাল।
গৌরী শুধু বললেন–
–বন্ধু, তুই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলি–
আমাদের সঙ্গে বুড়ো হবি।
এত তাড়াতাড়ি চলে গেলি?
অরুপের ইচ্ছা অনুযায়ী–
তার সমাধির পাশে লেখা হলো–

"ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নয়, আলো হয়ে থাকার জন্য।"
বছর কয়েক পরে–
একদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ নিতাই শিলপুকুরের ধারে বসে আছেন।
গৌরী তার কাঁধে মাথা রেখেছেন।
দুজনেই নীরব।
আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।
হঠাৎ গৌরী বললেন–
–নিতাই, ক্লান্ত লাগছে।
–ঘুমাবি?
–হ্যাঁ।
অনেকদিনের ঘুম।
নিতাই মৃদু হেসে তার হাত শক্ত করে ধরলেন।
–আমি আছি।
ভয় কিসের?
দূরে বটগাছের পাতা দুলল।
মনে হলো–
হরনাথ, গঙ্গা, হরিচরণ মাস্টারমশাই, অরূপ–
সবাই যেন ডাকছেন।
আর সেই রাতে–
পূর্ণিমার আলোয়,
স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে,
লোকমাতা গৌরী শান্ত ঘুমে তলিয়ে গেলেন।
চোখের কোণে একফোঁটা হাসি।
মুখে অপূর্ব প্রশান্তি।
নিতাই তার কপালে হাত রেখে ফিসফিস করে বললেন–
–পাগলি, এত তাড়াহুড়ো করলি কেন?
আমি তো আসছি...
আকাশভরা তারা তখন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।
– ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত —

সপ্তত্রিংশ ও শেষ অধ্যায়
অনন্তের পথে
"মানুষ মরে না– মানুষের শরীর মরে। ভালোবাসা, ত্যাগ, আদর্শ আর আলোর উত্তরাধিকার অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকে।"
গৌরীর বিদায়ের পর কেটে গেছে তিনটি বছর।
লোকমাতা গৌরী শিক্ষানগরের আকাশে এখনও ভোরবেলায় বিদ্যালয়ের ঘণ্টা বাজে, গ্রন্থাগারে বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ শোনা যায়, অনাথ আশ্রমের উঠোনে শিশুরা হাসে, হাসপাতালের দরজায় অসহায় মানুষ ভরসা নিয়ে আসে।
কিন্তু শিলপুকুরের ধারে সেই বেঞ্চটিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একাই বসে থাকেন বৃদ্ধ নিতাই।
সাদা ধুতি।
কাঁপা হাত।
চোখে মোটা চশমা।
কিন্তু দৃষ্টিতে আজও সেই পুরোনো ভালোবাসা।
তিনি ধীরে ধীরে বলেন–
–পাগলি, আজ দীপশিখা মাটির পুতুল বানিয়েছে।
আজ হরিদীপ একটা নতুন হাসপাতাল খুলেছে।

আজ একটা অনাথ ছেলে ডাক্তার হয়েছে।
সবই তোর আশীর্বাদ।
বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতা দুলে ওঠে।
মনে হয়–
গৌরী যেন আজও শুনছে।
দীপশিখা এখন যুবতী।
চোখে প্রখর মেধা।
হৃদয়ে মমতা।
দাদু অরূপ সেনের গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনা করে।
দিদিমা গৌরীর ডায়েরি পড়ে।
আর প্রপিতামহ হরনাথের মাটির চাকার সামনে দাঁড়িয়ে নীরবে প্রণাম করে।
একদিন সে নিতাইকে জিজ্ঞেস করল–
–দাদু, এত বড় কাজ তোমরা কীভাবে করলে?
নিতাই মৃদু হেসে বললেন–
–আমরা কিছু করিনি মা।
মানুষ আমাদের ভালোবেসেছিল।
আমরা শুধু সেই ভালোবাসা ফিরিয়ে দিয়েছি।
–আমি কী করব?
–মানুষ হবি।
এইটুকুই।
সময় আরও এগিয়ে যায়।
এক শীতের বিকেলে নিতাই অনুভব করলেন–
তার পথও শেষের দিকে।
তিনি হরিদীপকে ডাকলেন।
দীপশিখাকে ডাকলেন।
তারপর বললেন–
–আমাকে শিলপুকুরের ধারে নিয়ে চল।
বটগাছের নিচে সেই পুরোনো বেঞ্চে বসানো হলো তাকে।
সূর্য অস্ত যাচ্ছে।
জলে লাল আভা।
হঠাৎ বৃদ্ধ নিতাই মৃদু হেসে উঠলেন।
–গৌরী!
দেখ, আমি এসেছি।
দীপশিখা অবাক হয়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে রইল।
নিতাই যেন দূরে কাউকে দেখছেন।
তার চোখে তখন অশ্রু নয়–
আনন্দ।
–অরূপ, তুইও আছিস?
মাস্টারমশাই!
কাকাবাবু!
মা গঙ্গা!
সবাই এসেছ?
হরিদীপ কাঁদতে কাঁদতে তার হাত ধরে বলল–
–বাবা!

নিতাই শান্ত কণ্ঠে বললেন–
–কাঁদিস না।
মানুষকে ভালোবাসিস।
এটাই আমাদের ধর্ম।
এই ছিল তাঁর শেষ কথা।
পূর্ণিমার চাঁদ উঠতে শুরু করেছে।
আর সেই চাঁদের আলোয়–
নিতাই চক্রবর্তী অনন্তের পথে যাত্রা করলেন।
তারপর বহু বছর।
সময়ের স্রোত।
প্রজন্ম বদলেছে।
কিন্তু লোকমাতা গৌরী শিক্ষানগরের প্রদীপ নিভে যায়নি।
দীপশিখা এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ।
হরিদীপ বৃদ্ধ।
তবু প্রতিদিন ভোরে বিদ্যালয়ের প্রার্থনায় আসেন।
বিশ্বের নানা দেশ থেকে মানুষ আসে।
তারা দেখে–
এক কুমোরের ভাঙা ঘর থেকে কীভাবে জন্ম নিয়েছিল এক মহীরুহ।
তারা দেখে–
মাটির চাকা।
বটগাছ।
শিলপুকুর।
আর চারটি সমাধি–
অরূপ সেন।
নিতাই চক্রবর্তী।
লোকমাতা গৌরী।
হরিদীপের পাশে পরবর্তীকালে দীপশিখাও নিজের ইচ্ছায় একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন–
"মানুষের জন্য মানুষ"।
প্রতি বছর গৌরী পূর্ণিমার দিনে হাজার হাজার শিশু হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে শিলপুকুরের চারপাশে দাঁড়ায়।
সেই প্রদীপের আলোয় ভেসে ওঠে একটি গান–
"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে..."
আর শিশুরা একসঙ্গে উচ্চারণ করে–
"মানুষ বড়, ধর্ম তার চেয়েও বড় নয়। ভালোবাসা বড়, সম্পদের চেয়েও বড়। ত্যাগ বড়, অহংকারের চেয়েও বড়।"
রাত গভীর হয়।
পূর্ণিমার আলোয় বটগাছের পাতা নড়ে ওঠে।
মাটির চাকা যেন নিঃশব্দে ঘুরতে থাকে।
আর দূর আকাশের তারাদের মাঝে–
হরনাথ পাল, গঙ্গা দেবী, হরিচরণ মাস্টারমশাই, অরূপ সেন, গৌরী ও নিতাই–
হয়তো আজও হাসছেন।
কারণ–
তাঁদের জীবন শেষ হয়নি।
তাঁদের আলো এখনও জ্বলছে।
জ্বলবে।

যতদিন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের চোখের জল মুছে দেবে,
যতদিন একটি শিশু বই হাতে নতুন স্বপ্ন দেখবে,
যতদিন পৃথিবীতে ভালোবাসা থাকবে—
ততদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন।
উপসংহার
"মানুষ চলে যায়,
কিন্তু মানুষের জন্য করা ভালোবাসা কখনো মরে না।
একটি মাটির চাকা থেকে শুরু হওয়া স্বপ্ন
অনন্তের পথে চলতেই থাকে..."

— সমাপ্ত —

লেখকের নিবেদন
প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,
এই উপন্যাস কোনো রাজা-রানির বিজয়গাথা নয়, কোনো অলৌকিক কাহিনিও নয়।
এ এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প।
এক কুমোরের ঘরের দরিদ্র কন্যা, তার সংগ্রাম, তার ভালোবাসা, তার ত্যাগ এবং মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে কিভাবে এক নারী "লোকমাতা"-য় পরিণত হতে পারেন— সেই কাহিনিই এই উপন্যাসের প্রাণ।
হরনাথ পালের মাটির চাকা শুধু মাটির পাত্র সৃষ্টি করেনি— সৃষ্টি করেছে আদর্শ, শিক্ষা, মানবতা এবং ভালোবাসার এক অনন্ত উত্তরাধিকার।
এই কাহিনির নিতাই, অরূপ, হরিচরণ মাস্টারমশাই, রশিদ মিঞা, গঙ্গা দেবী কিংবা ছোট্ট দীপশিখা— সকলেই আমাদের সমাজের সেই মানুষদের প্রতীক, যাঁরা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলেন।
এই উপন্যাসের যদি কোনো সার্থকতা থাকে, তবে তা একটাই—
মানুষের চেয়ে বড় কোনো পরিচয় নেই।
সকল পাঠক-পাঠিকাকে আমার আন্তরিক প্রণাম ও শুভেচ্ছা।
— লেখক

পাত্রপাত্রীর পরিচয়
হরনাথ পাল
একজন দরিদ্র কুমোর। আদর্শবান, পরিশ্রমী এবং শিক্ষাপ্রেমী। তাঁর স্বপ্ন থেকেই একদিন জন্ম নেয় "লোকমাতা গৌরী শিক্ষানগর"।
গঙ্গা দেবী
গৌরীর মা। মমতা, ত্যাগ এবং সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি।
গৌরী পাল চক্রবর্তী (লোকমাতা গৌরী)
উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সংগ্রাম, শিক্ষা, মানবতা ও মাতৃত্বের এক উজ্জ্বল প্রতীক।
নিতাই চক্রবর্তী
গৌরীর জীবনসঙ্গী। নীরব প্রেম, ত্যাগ ও নিষ্কাম ভালোবাসার প্রতীক।
অরূপ সেন
বন্ধুত্ব, আত্মত্যাগ এবং মহৎ মানবিকতার এক অনন্য চরিত্র।
হরিচরণ মাস্টারমশাই
শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং নৈতিক শক্তির প্রতীক।
রশিদ মিঞা
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতার প্রতীক।
অধ্যাপক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
হরনাথ পালের সহপাঠী এবং স্বপ্নপূরণের অন্যতম কারিগর।
হরিদীপ
নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। সেবার আদর্শে গড়া এক মানবিক চিকিৎসক।
দীপশিখা

উত্তরাধিকারের আলোকবর্তিকা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আশা।

পরিশিষ্ট

কুমোরপাড়ার সেই মাটির চাকা আজ আর শুধু একটি বস্তু নয়।

তা এক দর্শন।

যে দর্শন বলে—

"মাটি থেকেই মানুষের জন্ম, আবার মাটিতেই তার বিলয়। কিন্তু মানুষের কর্ম, ভালোবাসা আর আদর্শ— তা কখনো মাটিতে মিশে যায় না।"

সম্ভবত কোনো পূর্ণিমার রাতে, শিলপুকুরের শান্ত জলে চাঁদের আলো পড়লে, বটগাছের পাতায় বাতাস দুললে, কোনো শিশু যখন প্রথম বর্ণপরিচয় হাতে নিয়ে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখবে—

তখন কোথাও অদৃশ্যভাবে হাসবেন হরনাথ পাল।

গৌরী মায়ের স্নেহময় হাত আশীর্বাদের মতো নেমে আসবে।

নিতাইয়ের নীরব ভালোবাসা বাতাসে মিশে থাকবে।

অরুপের জ্ঞান ও ত্যাগ গ্রন্থাগারের পাতায় পাতায় বেঁচে থাকবে।

আর হরিচরণ মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠ যেন দূর থেকে ভেসে আসবে—

"বড় মানুষ নয়, ভালো মানুষ হবি।"

উৎসর্গ

এই উপন্যাস উৎসর্গ করা হলো—

সমস্ত শিক্ষককে,

সমস্ত মাকে,

সমস্ত নীরব প্রেমিককে,

সমস্ত নিঃস্বার্থ বন্ধুকে,

এবং সেই সকল মানুষকে—

যাঁরা এখনও বিশ্বাস করেন,

"মানুষের জন্য মানুষ।"

উপন্যাস সমাপ্ত